বাংলা কিংবদন্তী

সংকলক : আসাদুজ্জামান জুয়েল

কিংবদন্তী কী? কিংবদন্তী হচ্ছে মানুষের মুখে মুখে বহুকাল ধরে চলে আসছে এমন সব গল্প বা জনশ্রুতি। কিন্তু, কিংবদন্তী কি কেবলমাত্র গল্প বা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত জনশ্রুতি? এক্ষেত্রে একটা প্রশ্নবোধক থেকেই যায়...কারণ অনেকক্ষেত্রে ইতিহাসের উৎস হিসাবে রসদ যোগায় এই কিংবদন্তী। আবার একে অবহিত করা যায় প্রাচীন সমাজের সম্পদ বলেও। তবে কিংবদন্তীকে পুরোপুরি ইতিহাসও বলা চলে না। সত্য ও কল্পনা–এ দুইয়ের মিশ্রণে সৃষ্টি হয় কিংবদন্তীর।

ইতিহাস যেখানে এসে মৌন হয়ে যায়, কিংবদন্তী সেখানে সরব হয়ে ওঠে। এটি হতে পারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, দেবদেবী কেন্দ্রিক, মেলা অথবা হতে পারে দিঘি কেন্দ্রিক।

এর মূলধারা হলো–কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের মেধা বা কল্পনায় প্রসবণ হয় না। বরং যুগ যুগ ধরে এটি ঘুরেফিরে সাধারণ মানুষের মুখে। হয়তো কেউ শুনেছে তার দাদার কাছে, তার দাদা শুনেছে তার পরদাদার কাছে–এভাবেই একসময় তা ঠাঁই করে নিয়েছে জনমনে। আবার কখনও কখনও পরিণত হয়েছে বিশ্বাসে।

কিংবদন্তীর গল্পগুলো কখনও স্বতন্ত্র, আবার কখনও প্রায় একই ধাঁচের। এসবের দায় পড়ে তৎকালীন আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস, এমনকি রাজনীতির ওপরেও। আবার, এমনও ঘটতে দেখা যায়–কালের পরিক্রমায় একই নাম, একই ঘটনা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে; কখনও বা দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে বিস্তৃতি পায় ভিনদেশেও; কখনও বা এর উৎসকে আলাদা করে চিহ্নিত করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এমনই সব গল্প বা জনশ্রুতি, যা বহুকাল ধরে আমাদের দেশের মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে, সেসব গল্পের সামান্য কতক একত্রিত করার ছোট্ট একটি চেষ্টা করা হয়েছে "বাংলা কিংবদন্তী" বইটিতে।

www.BanglaBook.org

Bangla Kingbodontee

Asaduzzaman Jewel

Cover ■ Sazal Chowdhury

ভূমিপ্রকাশ

ISBN 978-984-93459-2-3

গভীর রাত। লৌহ বাসরে লখিন্দর ঘুমোচ্ছে পাশেই বেহুলা রয়েছে পাহারায়, কিছুতেই স্বামীর নাশ হতে দেবেন না। কিন্তু এক সময় তন্দ্রায় তিনিও ঘুমিয়ে গেলেন। ছিদ্র পথে কালনাগিনী প্রবেশ করে বেহুলার চুল বেয়ে বিছানায় ঘুমন্ত লখিন্দরের প্রাণ নাশ করলো। সফল হলো মনসার ষড়যন্ত্র।

প্রথা অনুসারে সাপে কাটা লখিন্দরকে কলাগাছের ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হলো নদীর জলে। তবে ভেলায় শুধু লখিন্দরই নয়, তার সাথে যাত্রা করতে চাইলেন বেহুলা। লক্ষ্য তার স্বর্গ। সবার শত কাকুতি-মিনতির পরেও স্বামী লখিন্দরের সঙ্গী হলো সতীসাধ্বী বেহুলা। সে দৃঢ়চিত্তে সংকল্প করে, যে করেই হোক দেবতাদের কাছ থেকে প্রাণ ফিরিয়ে আনবেনই লখিন্দরের।

আসাদুজ্জামান জুয়েল বেড়ে উঠেছেন শান্ত-নিরিবিলি দিনাজপুর শহরে। বর্তমানে ব্যবস্থাপনা বিভাগে স্নাতক পড়ার পাশাপাশি যুক্ত আছেন ব্যবসায়।
ছোটোবেলা থেকে বইয়ের সাথে সখ্য। স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর সমৃদ্ধ একটি পাঠাগার বানিয়ে যাবার। মূলত, ছোটোদের জন্য লিখতে পছন্দ করেন। পাশাপাশি পছন্দ করেন ভৌতিক গল্প লিখতে।
"বাংলা কিংবদন্তী" লেখকের প্রথম একক বই।

www.BanglaBook.org

বাংলা কিংবদন্তী

বাংলা কিংবদন্তী

সংকলক : আসাদুজ্জামান জুয়েল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

৪৬

বাংলা কিংবদন্তী
সংকলক : আসাদুজ্জামান জুয়েল
প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৯
© প্রকাশক ২০১৯
প্রচ্ছদ অলংকরণ সজল চৌধুরী
অক্ষরবিন্যাস সংকলক
বর্ণ অলংকরণ সজল চৌধুরী
বানান সংশোধন জাকির হোসেন, সজল চৌধুরী

ভূমিপ্রকাশ'র পক্ষে ৩৮, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০ থেকে
জাকির হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং ফেইথ প্রিন্টিং প্রেস, ৮৬/বি এলিফ্যান্ট রোড,
ফরিদাবাদ, ঢাকা ১২০৪ থেকে মুদ্রিত।
মুঠোফোন : ০১৭৮০৩২২৩৩৩

মূল্য : একশত ষাট টাকা মাত্র
Price: Three Hundred And Sixty Taka only| $7

Bangla Kingbodontee [A Collection of Local Myth] by **Asaduzzaman Jewel**
Published by **Zakir Hossain, BhumiProkash,**
38 Banglabazar (1st Floor), Dhaka-1100
Email: bhumiprokash@gmail.com **FB:** fb.com/bhumiprokashofficial
Published: Feb. 2019
ISBN 978 984 93459 2 3
ঘরে বসে রকমারির মাধ্যমে বই পেতে অর্ডার করুন : ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১-৩/১৬২৯৭
অথবা ভিজিট করুন : www.rokomari.com
অনলাইন পরিবেশক : বিবিধ-Bibidh : fb.com/BibidhShop/

ভূমিকা

কিংবদন্তী আসলে কী? কিংবদন্তী হচ্ছে জনশ্রুতি, মুখে মুখে প্রচলিত কথা বা গল্প। কিন্তু, কিংবদন্তী কি নিছকই গল্প? এখানে একটা প্রশ্নবোধক থেকেই যায়...কারণ ইতিহাসের উৎস কিংবদন্তী। কিংবদন্তী প্রাচীন সমাজের সম্পদ।

কিন্তু কিংবদন্তী পুরোপুরি ইতিহাস নয় আবার রূপকথাও নয়। সত্য ও কল্পনার মিশ্রণে সৃষ্টি হয় কিংবদন্তী।

ইতিহাস যেখানে চুপচাপ, কিংবদন্তী সেখানে সরব। এটি হতে পারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, দেবদেবীকেন্দ্রিক, মেলা অথবা হতে পারে দিঘি কেন্দ্রিক।

এর মূলধারা হলো এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের মেধা বা কল্পনায় প্রসবণ হয় না। যুগ যুগ ধরে এটি ঘুরেফিরে সাধারণ মানুষের মুখে। হয়তো কেউ শুনেছে তার দাদার কাছে, তার দাদা শুনেছে তার পরদাদার কাছে এভাবেই একসময় তা ঠাঁই নিয়েছে বিশ্বাসে। এটাই কিংবদন্তী।

কিংবদন্তীর গল্পগুলোর কতক স্বতন্ত্র আবার কিছু কিছু একই ধাঁচের। তৎকালীন আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস এমনকি রাজনীতির কাঁধে ভর করে সৃষ্টি হয় কিংবদন্তীর। আবার, এমনও ঘটনা ঘটে একই নাম, একই গল্প বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে। যেমন, একটার উদাহরণ দেই, *"কমলা রাণীর দিঘি"*। এই নামে চারটি দিঘির খোঁজ আমি পেয়েছি, প্রথমটি মৌলভীবাজারে, দ্বিতীয়টি বানিয়াচং-এ, তৃতীয়টি বরিশালে ও চতুর্থটি হচ্ছে নেত্রকোনার যার কিছু অংশ বর্তমানে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সময়কাল ভিন্ন, রাজার নাম ভিন্ন কিন্তু ঘটনার কী অদ্ভূত মিল! এমন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, আগেই বলেছি কিংবদন্তী হচ্ছে জনশ্রুতি কিংবা মুখে মুখে প্রচলিত কথা বা গল্প।

আমাদের দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য কিংবদন্তী রয়েছে। যেগুলোতে আমরা দেখতে পাই পীর-ফকির, দেব-দেবীর সংস্পর্শ্যতা। এটা শুধু আমাদের দেশেই নয় বরং উপমহাদেশেই পরিলক্ষিত হয়। আমরা যদি কয়েক শ বছর পেছনে প্রাচীন যুগে ফিরে যাই তবে দেখতে পাই দেব-দেবীর মাহাত্ম্য। আবার মধ্যেযুগে মুসলিম শাসকদের সাথে এদেশে প্রবেশ করে অসংখ্য পীর-ফকির, দরবেশ। দেশের বড়ো বড়ো নদ-নদীগুলো পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে হওয়াতে সে অঞ্চলগুলোই আওলিয়াদের

প্রাথমিক স্টেশন খেয়াল করা যায়। এছাড়া রাজা-মহারাজা ও প্রভাবশালী জমিদারদের কীর্তি অমর করে রাখতে কতই না কিংবদন্তী ছড়িয়েছে!

ইতিহাস আমার কাছে ভালোবাসার একটি নাম। এর রহস্যগুলো জানতে আমার ভালো লাগে। কিংবদন্তীর গল্পসংকলন এই ভালোবাসারই ফসল। প্রথম যখন কিংবদন্তীর গল্পগুলো মলাটবন্দী করার প্রস্তাব পাই, অনেকটা ঝোঁকের মাথায় দায়িত্ব নেওয়া। কিন্তু কাজে নামতেই উপলব্ধি করি, লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ এই বিভাগটি কতটা অবহেলিত। এ সম্পর্কিত বই-পত্র যেমন অপ্রতুল, তেমনি প্রযুক্তির যাতাকলে কিংবা উপকরণগুলো কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ায় স্থানীয় মানুষও ভুলতে শুরু করেছেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা কাহিনিগুলো।

নানা অঞ্চলের কাহিনিগুলো আমি চেষ্টা করেছি মূলধারা বা ভাবটুকু বজায় রেখে নিজের মতো করে উপস্থাপন করতে। কিছু ক্ষেত্রে নথিপত্রের চেয়ে সরাসরি শোনা গল্পটাই তুলে দিয়েছি, যেমন, *রামসাগর, কমলারাণীর দিঘি* এবং *কুড়িটিলার কালো পাথর, শ্যামসুন্দর মঠ* এবং *দিনাজপুরের রংমহল*। এছাড়া কয়েকটি গল্প অপরিবর্তিতই রেখেছি।

সবার ক্ষুদ্র প্রয়াসে বইটি আজ আলোর মুখ দেখছে। **নীল** অনেক কষ্ট করে *"কুড়িটিলার কালো পাথরের"* ছবি ও ভিডিও তুলে দিয়েছে, *কমলারাণীর দিঘি* নিয়ে অনেক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছে। ছোটো আপ্পি **ফারহানা ওয়াজেরিন তিতলী** *"দিনাজপুরের রংমহল"* গল্পটায় তথ্য যোগান দিয়েছে। এছাড়া **ডা.বারিষা** আপু, নেত্রকোনার *কমলারাণীর দিঘির* খোঁজ দিয়েছেন। **তাসনিম চৈতি** খোঁজ দিয়েছেন জহির রায়হানের "হাজার বছর ধরে" উপন্যাসের বিখ্যাত *পরীর দিঘীর*। **ডা. রায়হান** ভাই খোঁজ দিয়েছেন *"সোনাবাড়িয়া শ্যামসুন্দর মঠের"*। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছে বন্ধু **নিকসন**। এছাড়াও ভালোবাসা তাদের জন্য, যারা ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে গেছেন।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যে দু'জন মানুষের কাছে চিরকৃতজ্ঞ, যারা না থাকলে বইটি কখনো আলোর মুখ দেখতো না–**"নীল চৌধুরী ও রুদ্র কায়সার"** তোমাদের জন্য ভালোবাসা।

–আসাদুজ্জামান জুয়েল
দিনাজপুর।

উৎসর্গ

আমার পিচ্চি ভাতিজি
ইরিনা'কে।
জীবন তোমাকে দু'হাতে পূর্ণতা দিক।

সূচীপত্র

০১.	দুইটি দিঘির গল্প	০৯
০২.	নাস্তিক পণ্ডিতের ঢিপি	১৩
০৩.	পুরীর জগন্নাথ বঙ্গের গোপীনাথ	১৬
০৪.	কোশাকান্দার কিংবদন্তী	১৯
০৫.	ধীরাজ-মাথিনের প্রেমকথা	২১
০৬.	পীর শাহ্ নেকমরদ ও নাথগুরু গোরাক্ষনাথ	২৪
০৭.	বেহুলা-লখিন্দরের বাসরঘর	২৬
০৮.	চোর চক্রবর্তীর ঢিবি	৩০
০৯.	কুড়িটিলার কালোপাথর	৩২
১০.	নামের কিংবদন্তী (অভ্যন্তরীণ ঢাকা)	৩৫
১১.	ঢাকার ঈশ্বরী ঢাকেশ্বরী	৩৯
১২.	কিংবদন্তীর বান্দরবান	৪১
১৩.	বগালেকের ড্রাগন	৪২
১৪.	গুড়পুকুরের মেলা	৪৪
১৫.	মেহেরপুর কালীবাড়ি ও হযরত শাহ্ রাস্তি	৪৬
১৬.	কমল বাওয়ালির উপাখ্যান	৫০
১৭.	গানস্ অব বরিশাল	৫৫
১৮.	সুন্দরবনের বাওয়ালী জাদুকর	৫৮
১৯.	আধ্যাত্মিক সাধক দস্তুর খান	৬১
২০.	চলনবিলের রবিনহুড : দস্যু মহর খাঁ	৬৫
২১.	কবি চন্দ্রাবতীর প্রেম	৬৯
২২.	বদর শাহ্'র অলৌকিক চেরাগ	৭৪
২৩.	ভাওয়ালগড়ের সন্ন্যাসী রাজা	৭৭
২৪.	শ্যামসুন্দর মঠ	৮৫
২৫.	দিনাজপুরের রংমহল	৮৯

দুইটি দিঘির গল্প

পুকুর কিংবা দিঘির নানা কিংবদন্তী গল্পের ভাণ্ডার আমাদের দেশ। এরকম অসংখ্য লোকগাঁথার খোঁজ মেলে হারহামেশাই। তবে সেগুলোর বেশিরভাগের সাথেই অলৌকিক অর্থাৎ ভূত-প্রেত-জ্বীন-পরী সংবলিত। কোনো কোনো পুকুর থেকে সোনার, রূপার হাড়ি পাতিল, থালাবাসন মানে তৈজসপত্র পাওয়া যেত ধার হিসেবে, কাজ শেষ হলে আবার জায়গা মতো ফেরত দিতে হতো, নতুবা বিপদ! আবার কিছু কিছু পুকুর আছে যেগুলোতে জ্বীনেরা বাস করতো। তারা আবার তাদের পছন্দ মতো লোকদের টাকার হাড়ি, সোনা-দানা প্রদান করতো। এদেশের মানুষ গল্পপ্রিয়। গল্পের ছলেই সৃষ্টি হয়েছে লোকগাঁথা। সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য। নিচের গল্পটি দুটি দিঘি নিয়ে। এর সাথে যেমন জড়িয়ে আছে ইতিহাস। তেমনই কিছুটা ব্যতিক্রমও। কমলারাণী কিংবা যুবরাজ রামের আত্মত্যাগে ভিজে উঠে চোখ।

BanglaBook.org

রামসাগর

দিনাজপুর অঞ্চলের রাজা তখন প্রাণনাথ। সুশাসক ও প্রজাপ্রিয় রাজা হিসেবে তার দেশ জোড়া খ্যাতি ছিল। অফুরন্ত ধনসম্পদের মালিক রাজা প্রাণনাথ। কিন্তু নিঃসন্তান রাজার মনে শান্তি ছিল না। রাজার অবর্তমানে কে ভোগ করবে এই

অগাধ সম্পত্তি ও বিশাল রাজ্য? তাই ভোগবিলাস ও প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুই রাজাকে আকর্ষণ করে না। একদিন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পুত্র কামনায় রাজা যাগযজ্ঞ, দানদক্ষিণা দিতে শুরু করলেন। অবশেষে দৈব কৃপায় রাজার ঘরে জন্ম নিলো এক পুত্র সন্তান। শুভদিনে রাজপুত্রের নাম রাখা হলো রাম। কিন্তু জ্যোতিষী মতে জানা গেল রাজকুমার হবেন স্বল্পায়ু এবং পরহিত ব্রত। আত্মদান করে অমর হবেন তিনি। আনন্দ ও বিষাদের মধ্য দিয়ে এভাবে রাজপুত্র যৌবনে পদার্পন করলেন। বৃদ্ধ রাজা স্থির করলেন পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে তিনি তীর্থে যাবেন। অভিষেক উৎসবের আয়োজন হলো। উৎসব কোলাহলে মেতে উঠলো রাজবাড়ি। ঠিক এমনি মুহূর্তে এলো দুঃসংবাদ। নগর আক্রান্ত হওয়ার আর বিলম্ব নেই। নিমিষে সব উৎসব স্তব্ধ হলো। চারদিকে যুদ্ধের সাজ সাড়া পড়ে গেল। সেনাপতি বেশে স্বসৈন্যে যুবরাজ উল্কার মতো ছুটে চললেন রণক্ষেত্রে। যুবরাজ যুদ্ধ জয় করে বীর বেশে ফিরে এলেন রাজবাড়িতে।

এদিকে উত্তরে তখন তীব্র খরা। নদী-নালা-পুকুর সবকিছু শুকিয়ে কাঠ। অনাবৃষ্টি আর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে মৃতপ্রায় জনপদ...মনে শান্তি নেই মহারাজা প্রাণনাথের। এমন সময় স্বপ্নাদেশ পেয়ে দয়ালু রাজা একটি দিঘী খননের আদেশ দিলেন। কয়েক হাজার শ্রমিকের নিরলস পরিশ্রমে মাত্র পনেরো দিনে খনন করা হলো সুবিশাল সুগভীর এক দিঘি। কিন্তু পানি উঠার নাম নাই! রাজা আবারো স্বপ্নে দৈববাণী শুনতে পেলেন, একমাত্র যুবরাজ রামনাথ যদি দিঘিতে পূজো দেন, তবেই দূর হবে পানির অভাব।

রাজার আদেশে মন্দিরের ঠিক মাঝ বরাবর বানানো হলো নাটমন্দির।

যুবরাজ রামনাথ সাদা পোশাক পরিহিত হয়ে হাতিতে চড়ে চললেন পূজো দিতে। হাতি চললো ধীরে ধীরে। পূজোর অর্ঘ্য হাতে নিয়ে যুবরাজ প্রবেশ করলেন মন্দির গৃহে। আর তখনই শুরু হলো কুলকুল শব্দে পানি ওঠা। যুবরাজ আটকা পড়লেন মন্দিরে। ধীরে ধীরে মন্দিরের চূড়াও ডুবে গেলো ফেনিল পরিষ্কার পানিতে। যুবরাজ রামের সলিল সমাধির বিনিময়ে দূর হলো পানির অভাব।

দিনাজপুর শহর থেকে ৮ কি.মি. দক্ষিণে রামসাগর। সুবৃহৎ দিঘি। বর্গাকার একখণ্ড জমির ওপর সাগরোপম এ দিঘিটি। উত্তর-দক্ষিণে এ দিঘির দৈর্ঘ্য ১১৮৩ গজ ও প্রস্থ ৩৮০ গজ। গ্রামীণ মনমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে এই নয়নাভিরাম দিঘিটির অবস্থান। দিঘির পশ্চিম পাড়ে পাথর বাঁধানো ঘাট আছে। প্রায় পঞ্চাশ ফুট প্রশস্থ এই ঘাট দিঘির অনেক ভেতর পর্যন্ত চলে গেছে। দিঘির গভীরতা প্রায় চল্লিশ ফুট এবং পাড়গুলো পাহাড়ের মতো উঁচু। প্রাকৃতির সৌন্দর্য্যের এই লীলানিকেতন অধুনা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের প্রমোদবিহার ও অবকাশ

BanglaBook.org

যাপনের এক আকর্ষণীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিনাজপুরে তৎকালীন জমিদার রামনাথ মতান্তরে তার পিতা প্রাণনাথ এ দিঘিটি খনন করেন এবং তার নামানুসারেই এই দিঘির নাম হয় রামসাগর। দেশের সর্ববৃহৎ মানবসৃষ্ট জলাশয়টির মাঝ বরাবর আজও শীতকালে ভেসে উঠে মন্দিরের কালচে চূড়া।

কমলা রাণীর দিঘি

দিল্লীর সিংহাসনে যখন আফগান শেরশাহ। সেসময় তার বৃহৎ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিলো বর্তমান মৌলভীবাজারের রাজনগর। তারপর ক্ষমতা বদলের পরিক্রমায়, ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সামন্ত রাজা সুবিধ নারায়ণ এই রাজ্যের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন। প্রজাবৎসল রাজা তার রাজ্য, স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করছিলেন। একদিন রাজা স্বপ্নে দেবীর আদেশ পেলেন, তার সাম্রাজ্যে ১২ একর, ১২ বিঘা, ১২ পোয়া, ১২ ছটাক জায়গাজুড়ে একটি দিঘি খনন করতে হবে। সেই সাথে দেবী বলে দিলেন দিঘিতে প্রথম কোদালের কোপ দানকারীকে যেন স্বর্ণের হার উপহার দেওয়া হয়। অন্যথায় রাজার অনিষ্ট হবে।

দেবী ভক্ত, প্রজাপ্রেমী রাজার আদেশে শুরু হলো কর্মযজ্ঞ। স্বপ্নে পাওয়া আদেশ অনুযায়ী, রাজা অক্ষরে অক্ষরে সব পালন করলেন। কিন্তু, যতই খোড়ে পানি তো উঠে না! দিঘীর পাড় জমে টিলা হয় কিন্তু পানির দেখা নাই। রাজা সুবিধ নারায়ণের কপালে ভাঁজ বাড়ে, তবে কি কিছু ভুল হলো? কিছুদিন পর রাজা আবার স্বপ্নে দেখলেন। কিন্তু চমকে উঠলেন দেবীর চাহিদা শুনে।

প্রাণপ্রিয় পত্নী কমলা রাণী যদি দিঘিতে গঙ্গা দেবীর পূজা করেন তাহলেই উঠবে পানি।

দিন যায়, রাত যায়, যায় দেবীর নির্ধারিত দিন। রাজা কেমন করে বলবে রাণীকে নিদারুণ নিষ্ঠুর এ কথা! অবশেষে দেবী নিজেই একদিন দেখা দিলেন রাণীকে। প্রজাবৎসল রাণী স্মিত হেসে স্বামী-সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পূজার উদ্দেশ্যে সাজে সজ্জিত হয়ে দিঘিতে পা রাখতেই শুরু হলো পানি ওঠা। পায়ের গোড়ালি ডুবিয়ে পর পদক্ষেপেই চতুর্দিক থেকে তীব্র বেগে পানি ওঠা শুরু হলো। পানির তীব্রতায় একসময় রাণীর সলিল সমাধি ঘটলো।

রাজা বলে হায়! প্রজা বলে হায়!

এদিকে রাণীকে হারিয়ে রাজা যখন পাগলপ্রায়, ঠিক তখনই একরাতে স্বপ্নে দেখলেন, রাণী তাকে বলছেন, "প্রতিদিন সূর্যদোয়ের সময় আমার সন্তানদের ঘাটে নিয়ে আসবে। আমি তাদের দুধ পান করাবো। কিন্তু শর্ত এই যে, ১২ বছরের আগে তুমি আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাহলেই তুমি আমাকে

BanglaBook.org

আবার ফিরে পাবে।" রাণীর কথামতো রাজা প্রতিদিন তার সন্তানদের ঘাটে নিয়ে যান। দূর থেকে দেখেন রাণী তার সন্তানদের দুধ পান করাচ্ছেন। এভাবে দিন যায়, মাস যায় শুধু চোখের দেখা কি আঁশ মেটে! একদিন, প্রতিদিনের মতো রাণী তার সন্তানদের দুধ পান করাচ্ছেন, চুপিসারে রাজা গিয়ে রাণীর আঁচল আঁকড়ে ধরলেন। রাণী তৎক্ষনাৎ ঘাটের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হলেন।

রাজা হায় হায় করে উঠে কিন্তু রাণীর দেখা আর মিললো না। শোকার্ত রাজার শোক বাড়াতে প্রথমে মারা গেলো রাজার সন্তানেরা, এরপরই একদিন মারা গেলেন রাজা সুবিধ নারায়ণ। নির্বংশ হলো রাজপরিবার কিন্তু কালের সাক্ষী হয়ে কমলা রাণীর দিঘি এখনো আছে স্বমহিমায় দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ মানবসৃষ্ট জলাশয় হয়ে। যে কিংবদন্তী দিঘির পাড়ে বসে এর সৌন্দর্যে পল্লীকবি জসীম উদ্ দীন লিখেছেন,

"কমলা রাণীর দিঘি ছিল এইখানে,
ছোটো ঢেউগুলি গলাগলি ধরি ছুটিত তটের পানে।
আধেক কলসী জলেতে ডুবায়ে পল্লী-বধূর দল,
কমলা রাণীর কাহিনী স্মরিতে আঁখি হত ছল ছল।"
(রাণী কমলাবতীর দিঘি)

*বানিয়াচং এর সাগর দিঘি যেটি কমলারাণীর দিঘি নামেই পরিচিত, সেটিকে ঘিরেও একই কাহিনির প্রচলন রয়েছে। ব্যতিক্রম হলো, এখানে রাণী ডুবে যাবার পর তাকে পুনরায় দেখা যাবার ঘটনা শোনা যায় না। কবি জসীম উদ্‌দীন তার কবিতাটি মূলত বানিয়াচং ভ্রমণের সময় বানিয়াচংয়ের দিঘিটি দেখেই লিখেছিলেন এবং এটিই মূলত দেশের মানবসৃষ্ট দ্বিতীয় বৃহত্তম দিঘি। গল্পের খাতিরে মৌলভীবাজারের দিঘির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

BanglaBook.org

নাস্তিক পণ্ডিতের ঢিপি

আজ থেকে হাজার বছর আগে একাদশ শতকে মগধে যখন পালবংশ জাঁকিয়ে বসেছে ঠিক তখনই জন্ম নিলো এক বৌদ্ধ শমণ, পিতা মাতা তার নাম রাখলো চন্দ্রগর্ভ।

ঘোর অমবস্যার রাত্রি, শুধু অদূরে একটি গুহা স্থানে অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখা প্রজ্জলিত। চারপাশ ঘিরে বসে থাকা কিছু মানবমূর্তির মধ্যে একটি সদ্য কৈশোর পেরোনো যুবা আলাদাভাবে আকর্ষণ করে। কিছুটা অস্থিরচিত্তে অজান্তে মন চলে যায় বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনীতে। এখানেই জন্ম এ তরুণ তন্ত্র সাধকের, চন্দ্রবংশের নৃপতি কল্যাণশ্রীর মধ্যমপুত্র রাজপুত্র চন্দ্রগর্ভ একদিন তাঁর রহস্যময়

BanglaBook.org

শৈশবকৈশোর পেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন তন্ত্রসাধনার বৃত্তে। বজ্রযানী তন্ত্রের সেই মন্ত্র পাঠের গণআসরে মদ ও সাধনসঙ্গিনী সঙ্গে উপবেশন করে আজ চূড়ান্ত প্রাপ্তির দিনে তার নাম হলো গুহ্যজ্ঞানবজ্র।

তরতর করে নদীর বুক চিরে এগিয়ে চলেছে খেয়ানৌকা। মাঝি হাওয়া বুঝে পাল তুলে দিয়েছে। সকালের হাওয়ায় সে পাল ফুলেফেঁপে ওঠে। মুদিত চোখে শুয়ে ছিলো শ্রীজ্ঞান দীপংকর। পাশেই অপূর্ব সুন্দর ছোট্ট দেব মূর্তি। মূর্তির কঠিন পাষাণ ঠোঁটে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত হাসি। ছোটোবেলায় রাজগৃহে কারিগরের সঙ্গী হয়ে শিখেছিলেন এই কাজ। তারপর অবসরে হাতে তুলে নেন এই কাজ। নদীর দু'কূল ছাপিয়ে বর্ষাভারানত গ্রাম্য জীবনের বাঁকে বাঁকে ভেসে ওঠে দীপংকরের বৈচিত্রময় দিনগুলি।

সেই কবে মায়ের ক্রোড় ছেড়ে পারিবারিক ধর্মীয় অনুশাসন অবজ্ঞা করে গিয়েছিলেন তন্ত্রের পথে।

তারপর কী জানি কোন অজ্ঞাত কারণে তন্ত্রের সেই পিচ্ছিল পন্থা পরিত্যাগ করে গ্রহণ করেছিলেন বৌদ্ধ শ্রমণের জীবন–শ্রামণ্যদীক্ষার পর তিনি পরিচিত হয়েছিলেন দীপংকর শ্রীজ্ঞান নামে। তার বুদ্ধিদীপ্ত হস্তক্ষেপেই যুদ্ধ থামিয়ে চেদিরাজের কন্যার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন ন্যায়পালের পুত্রের।

এরপর কতগুলো বছর কেটে গেছে, নালন্দা, বিক্রমশীলা, সোমপুর বিহার আরো কত পৃথিবীখ্যাত বিহারে দিন কেটেছে শ্রীজ্ঞানের। এক সময় তিব্বতের বৌদ্ধ রাজা লাঃ লামা ইয়োসি হোড্ (লাহ্লামা-যে-শেস্) তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি কামনায় দীপঙ্করকে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বর্ণোপহার ও পত্রসহ বিক্রমশীলায় দূত প্রেরণ করলেন। নির্লোভ নিরহঙ্কার দীপঙ্কর এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু, কতবার প্রত্যাখ্যান করবেন তিনি? নিয়তি কি আর খণ্ডন করা যায়!

নালন্দা প্রাঙ্গণে পায়চারি করছিলেন চিন্তিত দীপংকর। এক তরুণ ভিক্ষু ফিসফিস করে কী যেন বলে যায় ওর কানে। দেশে যবন এসেছে, বৌদ্ধবিহার-গুলো তাদের আক্রোশের কারণ হচ্ছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ান শ্রীজ্ঞান, সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেবার। জীবনের নৌকা আবারো তাকে ভাসিয়ে নেয় আরেক অধ্যায়ে। দীপংকর রওনা হন তিব্বতের পথে।

দূর্গম পথ পেরিয়ে অবশেষে দীপংকর পৌছুলেন তিব্বত। তিব্বত তখন গোঁড়া ধর্মীয় অনুশাসনের যাতাকলে পিষ্ট। ধর্মের নামে হানা দিয়েছে কদর্যতা। নির্বাণ লাভের আশায় বহুদিনের অপেক্ষার অবসান হলো তিব্বতবাসীর।

তিব্বতরাজ চ্যাং চুব দীপংকরের শুভাগমন উপলক্ষে এক রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করলেন। যার দৃশ্য সেখানকার একটি মঠের প্রাচীরে আজও আঁকা আছে। সংবর্ধনা উপলক্ষে শুধু দীপঙ্করের উদ্দেশেই 'রাগদুন' নামক এক

BanglaBook.org

বিশেষ ধরনের বাদ্যযন্ত্র নির্মিত হয়েছিল। এ সময় রাজা চ্যাং চুব প্রজাদের উদ্দেশে ঘোষণা করেন যে, দীপঙ্করকে তিব্বতের মহাচার্য ও ধর্মগুরু হিসেবে মান্য করা হবে; বাস্তবে দীপঙ্কর এ সম্মান পেয়েছেনও। তিব্বতে তিনি মহাযানীয় প্রথায় বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধন করেন এবং বৌদ্ধ ক-দম্ (গে-লুক) সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিব্বতবাসীরা তাকে বুদ্ধের পরেই শ্রেষ্ঠ গুরু হিসেবে সম্মান ও পূজা করে এবং মহাপ্রভু (জোবো ছেনপো) হিসেবে মান্য করে।

*বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের দুটি ঢিপির বড়োটিকে স্থানীয় মানুষ বলে নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা যেটি অতীশ দীপংকরের জন্মভিটা, অপর ছোটো ঢিপিটিকে বলে টেলিবাটীর ভিটা। কারো কারো মতে এই নাস্তিক পণ্ডিত হলেন, বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রকার বল্লভাচার্য। তিনি শেষ বয়সে বৈষ্ণব ধর্ম ত্যাগ করে, শঙ্কর বেদান্তের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য দেশের লোক তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে নারাজ হয়। কেউ কেউ বলেন, বল্লভাচার্য বিক্রমপুরের ত্রিসীমানায়ও জন্মাননি। তাদের মতে ওটা ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ভিটা।

আবার দীপংকরে ফিরে আসি। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অসাধারণ প্রসার, কুসংস্কারমুক্ত ধর্মীয় বোধ সৃষ্টিতে শ্রীজ্ঞান দীপংকরের অসামান্য অবদানে "অতীশ" উপাধি পান। এভাবেই রাজপুত্র চন্দ্রগর্ভ থেকে তন্ত্রসাধক গুহ্যজ্ঞানবজ্র। আবার এই গুহ্যজ্ঞানবজ্র থেকেই জন্ম নিয়েছেন শ্রমণ দীপংকর শ্রীজ্ঞান। এরপর তিব্বতে গিয়ে হয়েছেন জোবো ছেনপো, পেয়েছেন উপাধি "অতীশ"।

সুদীর্ঘ ১৩ বছর তিব্বতে অবস্থানের পর দীপংকর শ্রীজ্ঞান ৭৩ বছর বয়সে তিব্বতের লাসা নগরের নিকটস্থ লেথান পল্লীতে ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তার সমাধিস্থল লেথান তিব্বতিদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২৮ জুন দীপঙ্করের পবিত্র চিতাভস্ম চীন থেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকায় আনা হয় এবং তা বর্তমানে ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত আছে আর তার নাড়িপোতা নাস্তিকপন্ডিতের ভিটা আজো ধ্বংসস্তূপ হয়ে বহন করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী দীপংকরের চিহ্ন।

BanglaBook.org

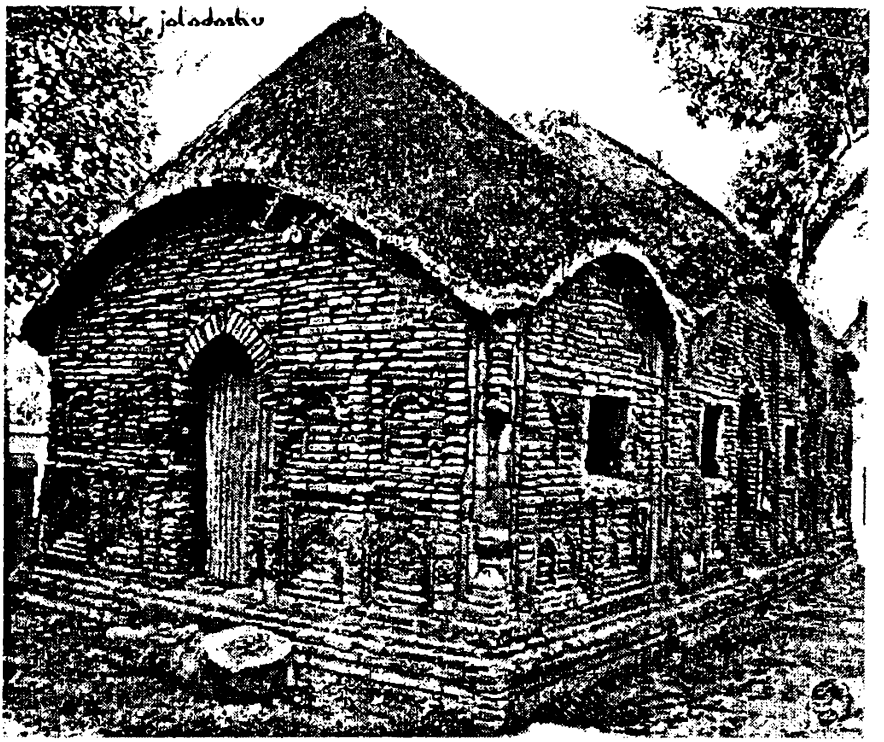

পুরীর জগন্নাথ, বঙ্গের গোপীনাথ

বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম ভূঁইয়া ঈশা খাঁ। তিনি ছিলেন কুসংস্কার মুক্ত, অন্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ও উদারপন্থী। ১৬০৪ সনে একদিন তিনি এগারোসিন্দুর হতে জঙ্গলবাড়ি যাচ্ছিলেন। যাবার পথে, রাজ্যহারা রাজা নবরঙ্গ রায়ের বাড়ি অতিক্রমকালে অত্যন্ত সুগন্ধীযুক্ত ঘ্রাণ তার নাকে ভেসে আসে। এমনই লোভনীয় সে ঘ্রাণ যে ঈশা খাঁ ঘোড়া থামিয়ে ঘ্রাণের উৎস খুঁজতে লাগলেন। জনৈক পথচারীকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই মোহকর ঘ্রাণ কোথা থেকে আসছে?"

পথচারী উত্তর দিল, "হুজুর, এই সুগন্ধ আসছে রাজা নবরঙ্গ রায়ের বাড়ি থেকে।"

তাৎক্ষণিক একজন সিপাহী পাঠালেন রাজা নবরঙ্গ রায়কে ডেকে আনার জন্য। সিপাহী ছুটলো রাজাকে খবর দিতে। বীর ঈশা খাঁয়ের আগমনের খবর পেয়ে রাজা নবরঙ্গ রায় তাড়াহুড়ো করে গেরুয়া চাদর গলায় মুড়িয়ে এসে শ্রদ্ধা নিবেদিত প্রাণে ঈশা খাঁকে অভিবাদন জানালেন।

ঈশা খাঁ জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘ্রাণের উৎস কী?"

BanglaBook.org

রায় বললেন, "এ দেবতার জন্য তৈরি ভোগের ঘ্রাণ। মসনদে আলা বঙ্গবীর আজ যদি আপনি দেবভোগের শরিক হতেন, তবে আমি চিরসুখী হতাম এবং রাজ্য হারার গ্লানি, দুঃখ কষ্ট অনুতাপ সবই ভুলে যেতাম।"

ঈশা খাঁ নবরঙ্গ রায়ের কথা ও চেহারার প্রশান্তিতে মুগ্ধ হয়ে আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন। রওনা হলেন নবরঙ্গের বাড়ির উদ্দেশ্যে। রাজা নবরঙ্গ রায় আয়োজনের কমতি রাখলেন না কোনো। উদার ঈশা খাঁ অত্যন্ত আনন্দের সাথে দেবতার ভোগ গ্রহণ করলেন।

তিনি রাজ্যহারা রায়ের কাছে রাজ্যচিন্তা বাদ দিয়ে তার এই পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইলেন। এরপর রায় অদ্ভুত এক গল্প শুরু করলেন; "বঙ্গবীর মসনদে আলা, আমি রাজ্য হারা হয়ে সাগর পাড়ে দিনরাত এক সাধুর আস্থানায় বসে থাকতাম। একদিন অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম। পরের দিন সকালবেলা সাধুর নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইলে সাধু বললে, 'একটি বিগ্রহ মূর্তি এনে এখানে স্থাপন কর। স্বপ্নে ভগবান এমনই নির্দেশ দিয়েছেন।' তখন আমি একটি মূর্তি এনে যথাস্থানে স্থাপন করে প্রতিদিন নিয়মিত ভোগ নিবেদন করে থাকি। তারপর থেকেই আমার জীবনে নেমে আসে প্রশান্তি। জীবনের পূর্ণতা ফিরে পাই। মসনদ আলা বঙ্গবীর, আপনি আমাকে রাজ্য হারা করে আর এক নতুন রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনি আশীবাদ করুন, এমনি ভাবধারায় যেন নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি।"

ঈশা খাঁ রায়ের এইরকম ব্যবহার ও কথায় অত্যন্ত মর্মাহত ও লজ্জিত হলেন। ভাবাবেগ লুকিয়ে তিনি বললেন, "আপনার রাজ্য আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম।"

কিন্তু নবরঙ্গ রায় নত শিরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "মসনদে আলা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর রাজত্ব করব না, আমি আজীবন দেবপূজায় ব্রত থাকতে চাই।" ঈশা খাঁ রায়ের মনোভাব বুঝতে পারলেন, তিনি ভাবতে লাগলেন কী করা যায়। কিছুক্ষণ রায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন, "চলুন আপনার দেবমূর্তি আমি পরিদর্শন করব।" স্বল্প দূরেই পূজোর স্থানটিতে সবাই যাত্রা করলেন। ছোট্ট একটি ঘর, তারই সম্মুখে একটি কষ্টিপাথরের তৈরি অপরূপ দেবমূর্তি, পাশেই একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে ঈশা খাঁ রায়কে জিজ্ঞেস করলেন, "দেবোত্তরের জরুরি আবশ্যকীয়তা কী?"

রায় বললেন, "একটি দিঘি, দেবমন্দির ও রথযাত্রার জন্য জমির প্রয়োজন।"

তখন ঈশা খাঁ দিঘির জন্য ৫০ বিঘা জমি, যাকে কোঠামন দিঘি বলা হয়। দেবমন্দিরের জন্য কোঠা নির্মাণের যাবতীয় খরচ। রথযাত্রা ও দেবালয়ের নির্দিষ্ট

BanglaBook.org

জায়গা জমি যতটুকু আবশ্যকীয় সমুদয় লাখেরাজ দেবোত্তরে দান করলেন। সেই সাথে বেতাল মৌজা থেকে প্রাপ্ত আয়ের অর্থ দেবতার ভোগের জন্য ব্যয় করবেন। তখন হতে উক্ত মৌজার নামকরণ হয় ভোগবেতাল। প্রতিটি ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করে ঈশা খাঁ এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

সেসময় থেকে আজ পর্যন্ত গোপী নাথের মন্দিরে প্রতি বৎসর রথযাত্রা আরম্ভ হয়। বাংলার হিন্দু ধর্মপ্রাণ, আবালবৃদ্ধবণিতা, লক্ষ লক্ষ যাত্রিক এসে ভিড় জমায়। সে সময় এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হতো, গজে মানুষে বিরাট রথটিকে টানত। মঠখোলার অষ্টমীর স্নান কালীবাড়ি আর গোপীনাথের বাড়িতে রথযাত্রা, এগারোসিন্দুর এবং দেওয়ান ঈশা খাঁয়ের এক অপূর্ব ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে গোপীনাথের মন্দির। বাংলায় প্রথম রথযাত্রার প্রচলন শুরু হয়েছিল এই প্রাচীন মন্দিরটি থেকেই। কথিত আছে, ঈশা খাঁ মোঘল সেনাপতি মানসিংহকে পরাজিত করে এই মন্দির প্রাঙ্গনেই বিজয় উৎযাপন করেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

কোশাকান্দার কিংবদন্তী

বাংলার বারভূঁইয়া প্রধান ঈশা খাঁ দিল্লীর দরবার থেকে বাইশ পরগনার দেওয়ানি সনদ নিয়ে তার রাজধানী জঙ্গলবাড়িতে ফেরার পথে, কীর্তিনাশা নদীর শ্রীপুরের ঘাটে আশ্রয় নিলেন। দীর্ঘ পথ ক্লান্তিতে ঈশা খাঁ রাত্রি যাপনের জন্য শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের আশ্রয় চাইলেন। রাজা কেদার রায় সানন্দে তার মহলে ঈশা খাঁ'র বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। বিশ্রামের এক ফাঁকে সৌম্যদর্শন ঈশা খাঁর চোখ আটকে গেলো এক তরুণীকে দেখে। জানা গেলো, অপূর্ব সুন্দরী সেই তরুণী আর কেউ নয়, কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের বাল্য বিধবা ভগ্নী। নাম তার "স্বর্ণময়ী"। বাল্যকাল থেকে ভালোবাসা বঞ্চিত স্বর্ণময়ীরও চোখ এড়ায়নি ঈশা খাঁর প্রেমময় দৃষ্টি। তিনিও সুপুরুষ ঈশা খাঁর প্রতি আকৃষ্ঠ হলেন। চোখেচোখে কথা হয়ে গেলো তাদের।

ঈশা খাঁ তার কোশার বহর নিয়ে শ্রীপুরে রাত্রিযাপন করে, শেষ রাতে অসংখ্য প্রহরী বেষ্টিত রাজবাড়ি থেকে স্বর্ণময়ীকে হরণ করে সূর্য উঠার আগেই কোশার বহর জঙ্গলবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কোশাবহর শ্রীপুর থেকে ঢাকায় পৌছালো। ঢাকায় এসে ঈশা খাঁ তার আর স্বর্ণময়ীর বিয়ে উপলক্ষে সমস্ত উপঢৌকন, মিষ্টি, পান-সুপারী ও সিঁদুর ক্রয় করে তা আলাদা একটি কোশা ভর্তি করে নিলেন। আবার কোশাবহর জঙ্গলবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। সে কোশাবহর শীতলক্ষ্যা, বানার ও ব্রহ্মপুত্র হয়ে এগারো সিন্দুর পৌছালো।

সে সময়ে ব্রহ্মপুত্র থেকে মির্জাপুর হয়ে একটি শাখা নদী জঙ্গলবাড়ির সঙ্গে প্রবল বেগে প্রবাহিত হতো। পরদিন ঈশা খাঁ এগারো সিন্দুর থেকে সেই নদীতে

BanglaBook.org

জঙ্গল বাড়ির উদ্দেশ্যে কোশা ছাড়ার হুকুম দিলেন। কারণ এতে করে দ্রুত জঙ্গলবাড়ি পৌছানো যাবে। কোশা ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ঈশা খাঁ স্বপ্নে শুনতে পেলেন, জলের অধিষ্ঠাত্রী গঙ্গাদেবী তাকে বলছেন, "হে ঈশা, তুমি আমার বোনঝি স্বর্ণময়ীকে আগামীকাল বিয়ে করতে যাচ্ছো, এ উপলক্ষে সবাইকে মিষ্টিমুখ করানোর জন্য ঢাকা থেকে এক কোশা মিষ্টিও নিয়ে আসছ। তবে আমাকেও এ মিষ্টির একটি অংশ সামনের কুঁড়ে (বর্তমান কোশাকান্দা গ্রামটি সে নদী ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনা ছিল) দিয়ে যেও।"

ঈশা খাঁর তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল, স্বপ্নের কথা তিনি কাউকে বললেন না। কিন্তু ঘটনা ঘটলো কোশার বহর সেই কুঁড়ে পার হয়ে যাওয়ার সময়। শান্ত অতল জলে মিষ্টি ও পান-সুপারি ভর্তি কোশাটি সেই কুঁড়ে কোনো কারণ ছাড়াই ডুবে গেল। ঈশা খাঁ অন্যান্য বহরের কোশার সাহায্যে শিকল লাগিয়ে ডুবন্ত কোশাটিতে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। কিন্তু হায়! কোশাটিতে যেন এক অপার্থিব, অসুরিক শক্তি ভর করেছে। শেষ পর্যন্ত কোশাটি তুলতে ঈশা খাঁ ব্যর্থ হলেন। তিনি বিলম্ব না করে সেখানেই কোশাটি রেখে চলে গেলেন।

জঙ্গলবাড়িতে পৌছেই মহা সমারোহে শুরু হলো বিয়ের প্রস্তুতি। নির্দিষ্ট দিনে ঈশা খাঁ ও স্বর্ণময়ীর বিয়ে হলো। কিন্তু, ঘটনার কিন্তু শেষ হলো না...

নদীটি দিন দিন চর পড়ে ভরাট হলে সেই কোশাটিও চরের তিন চার হাত ওপরের দিকে ভেসে উঠলো একদিন। এর কিছুদিন পরেই কোশার আগা-পাছায় দুটি তালগাছ জন্মালো এবং প্রতি অমাবস্যার রাত্রিতে তালগাছ দুটিতে তীব্র আলো ঝিলিমিলি করতে দেখা যায়। ক্রমে কোশার আশেপাশের জায়গা মানুষ আবাদ করতে শুরু করলেও কোশার আকৃতিযুক্ত স্থানটিতে কেউ আবাদ করতে সাহস পেলো না।

একদিন সে গ্রামেরই একজন কোশার আকৃতিযুক্ত অংশে কোদালের একটি কোপ দেওয়ার সাথে সাথে মাটি থেকে গলগল করে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে এবং যে কোপ দিয়েছিল সেদিন থেকে সে চিরদিনের জন্য বধির হয়ে যায়।

সে থেকে স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস কোশাযুক্ত অংশটি যে কাটবে বংশপরম্পরায় তার ক্ষতি হবেই।

আজও সে বংশের লোকেরা বংশ পরম্পরায় বধিরতা রোগে ভুগে আসছে। স্থানীয় লোকদের কাছে আজও তারা "ধুনদার (বয়রা, বধির)" বংশ বলে পরিচিত। আজও সে স্তুপটি টিকে আছে অবিকল কোশার আকৃতি নিয়ে দুটি তালগাছ আকাশ ছুঁয়ে। এ কোশা থেকেই গ্রামটির নাম হলো কোশাকান্দা।

*কোশা–এক ধরনের ডিঙি বিশেষ।

BanglaBook.org

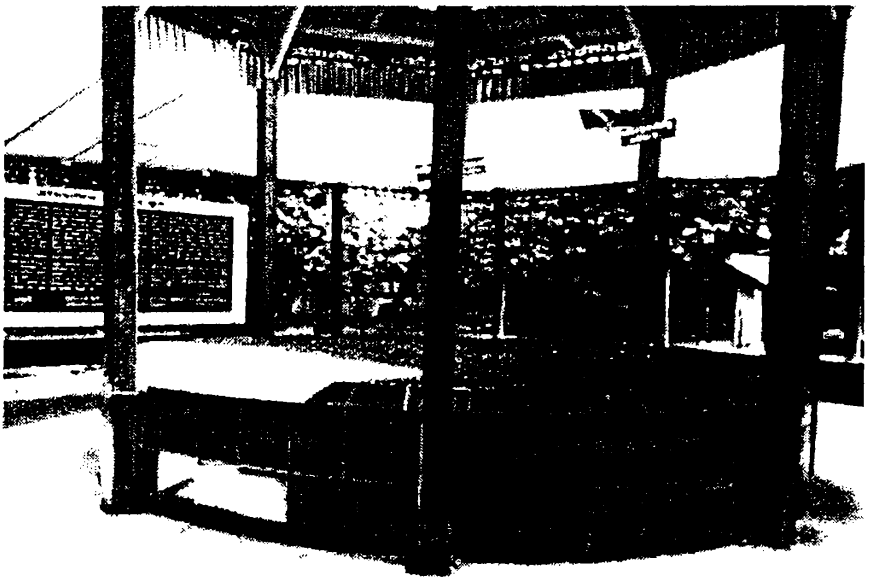

ধীরাজ-মাথিনের প্রেমগাঁথা

পুলিশ কোয়ার্টারের বারান্দার ইজি চেয়ারটিতে শুয়ে, ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করছিল ধীরাজ। অদূরে বিকেলের মরা রোদে নীলচে নাফের কালচে প্রতিকৃতি, আর মৃদুমন্দা ঢেউয়ের ছলাৎছলাৎ ধ্বনি মনে প্রশান্তি এনে দেয়। আজই টেকনাফে পৌঁছেছে ধীরাজ, এই থানার ইনচার্জ হয়ে। থাকার সঙ্গী বলতে আরেকজন পুলিশ অফিসার হরিনাথ বাবু আর একজন স্থানীয় চৌকিদার যুবক। কয়েকদিনের লঞ্চের ঝাঁকুনি আর ক্রমশ বৈরি ও দুর্গম হতে যাওয়া জনপদ ধীরাজের মনটা দমিয়ে দিয়েছিল। ধীরাজ ভাবতে থাকে, কয়েকদিন আগেও ছিলো নাট্যমঞ্চের নায়ক হয়ে আর আজ কেন এই পাণ্ডববর্জিত এলাকায়। প্রিয় কলকাতা, প্রিয় রঙ্গমঞ্চ আজ কত দূর! বাজার নামে একটি স্থান আছে বটে তবে, সে হচ্ছে আদিবাসীদের অবসরে চোলাই মদ চাখার আড্ডাখানা।

ধীরাজের চটকা ভাঙে হরিনাথ বাবুর কথায়, "কী মশাই, একেবারে ঝিম মেরে রইলেন যে! সবে তো শুরু, এখনই কি ভেঙে পড়লে চলে? জানেন তো নির্জনতারও একটি বিশেষ রূপ আছে, তাছাড়া কাল সকালেই রং-বেরঙয়ের পাখিতে যখন থানা প্রাঙ্গন ভরে যাবে, মন খারাপ পালাতে দিশা পাবে না।" রহস্যময় মুচকি হেসে চোখ টিপে দেন তিনি।

BanglaBook.org

পরদিন সকালে থানা প্রাঙ্গন থেকে ভেসে ওঠে পাতকুয়া থেকে পানি তোলার শব্দ আর সম্মিলিত কণ্ঠের কাকলি, হাসি ঠাট্টার কোলাহল। কৌতূহলী ধীরাজ জানালা দিয়ে দেখতে পান রং-বেরঙের পোষাক পরা, চুলের খোঁপায় ফুল-পালক গোঁজা রাখাইন কিশোরীদের। সে সময় খুব একটা না বুঝলেও পরদিন ভোরে ধীরাজের বুঝতে অসুবিধা হয় না হরিনাথ বাবুর রহস্যময় হাসির কারণ।

প্রাতঃরাশে চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, পুরো এলাকাতে শুধু এই থানা চত্বরেই রয়েছে পাতকুয়া। নাফের পানি সমুদ্রের সাথে মিলে লবণাক্ত, তাই পানযোগ্য পানির জন্য খুব সকালেই রাখাইন মেয়েরা এখান থেকে খাবার পানি নিয়ে যায়।

এভাবে কেটে যায় দিন কয়েক। দারোগা হিসেবে তরুণ সুদর্শন ধীরাজের তেমন কাজ নেই, হরিনাথ বাবুই সামলে নেন সবকিছু। নিয়মিত রুটিন কাজ। তারপরই অখণ্ড অবসর। এই নির্জনতা অসহ্য লাগে ধীরাজের, হাঁপিয়ে উঠে শহুরে মন।

একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যায় ধীরাজের। আড়মোড়া ভেঙ্গে বারান্দায় গিয়ে বসে। আর একটু পরেই রাখাইন মেয়েদের দল পানি নিতে আসবে এখানে। সাধারণত সামনাসামনি পড়তে চায় না ধীরাজ, সারাদিনের নীরবতায় সকালের কলকণ্ঠ হাসি ঠাট্টা ভালো লাগে ওর।

শুয়ে থাকতে থাকতে তন্দ্রা এসে গিয়েছিল ধীরাজের। পানি তোলার শব্দে তন্দ্রা কেটে যায়, পুব আকাশ সবে ফর্সা হতে শুরু হয়েছে, এত তাড়াতাড়ি তো কেউ পানি নিতে আসে না! তবে, কে সে? চোখ মেলতেই আবছা আলো আঁধারিতে এক নারীমূর্তি দেখা যায়। বেঁটে গড়নের চার কোণা মুখটাতে অন্যরকম এক শ্রী আছে, খোঁপায় বাহারি ফুলের মালা। ধীরাজের ভালো লেগে যায় অচেনা মেয়েটিকে। এক সময় মেয়েটির ও পানি তোলা শেষ হয়। দু'জনের চোখাচোখি হতেই স্মিত হেসে মেয়েটি চলে যায়, পেছনে এঁকে যায় ধীরাজের চোখে মুগ্ধতা।

স্থানীয় জমিদার ওয়াং থিনের একমাত্র রূপবতী কন্যা, নাম তার মাথিন। এই মাথিনই ভোরবেলা সবার আসার আগে পানি তুলে নিয়ে যেত। মাথিনকে দেখে মনে মনে ভালোবেসে ফেলে পুলিশ অফিসার ধীরাজ। এরপর থেকে প্রতিদিন ভোর সকালে থানার বারান্দায় বসে মাথিনের আসা-যাওয়া দেখতে দেখতে হৃদয় দেওয়া নেওয়ার এক পর্যায়ে তাদের দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠে ভালোবাসার সম্পর্ক। সম্ভব অসম্ভব নানা জল্পনা কল্পনার স্বপ্ন জালে আবদ্ধ হয় ধীরাজ ও মাথিন। কিন্তু মন দেওয়া নেওয়ার কিছুদিন যেতে না যেতেই কলকাতা থেকে হঠাৎ একদিন ধীরাজের কাছে ব্রাহ্মণ পিতার জরুরি টেলিবার্তা আসে।

BanglaBook.org

জরুরি কাজে কলকাতা যেতে হবে ধীরাজের। বাবার টেলিগ্রাম পেয়ে বহুদিন বাদে আবার কলকাতার জন্য মন কাঁদে ধীরাজের। যাওয়ার আগে খুব শ্রীঘ্রই ফিরে এসে মাথিনকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যায় ধীরাজ।

ফেরা হয় না ধীরাজের...

এ দিকে, ভালোবাসার মানুষ ফিরে আসার অধীর অপেক্ষায় অনাহার ও অনিদ্রায় দিন গুণতে শুরু করে জমিদার কন্যা মাথিন। ভালোবাসার প্রিয় মানুষটার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে অনিদ্রা আর অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে রাখাইন জমিদার কন্যা। বিষাদের কষ্ট এবং বেদনা-বিধুর প্রেমের বহুল আলোচিত সেই ঘটনার সাক্ষী আজকের ঐতিহাসিক মাথিনের কূপ। যা এখনো আকর্ষণীয় হয়ে আছে সীমান্ত উপজেলার টেকনাফ থানা কম্পাউন্ডে। পাতকুয়াটির নামকরণ করা হয় ঐতিহাসিক মাথিনের কূপ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

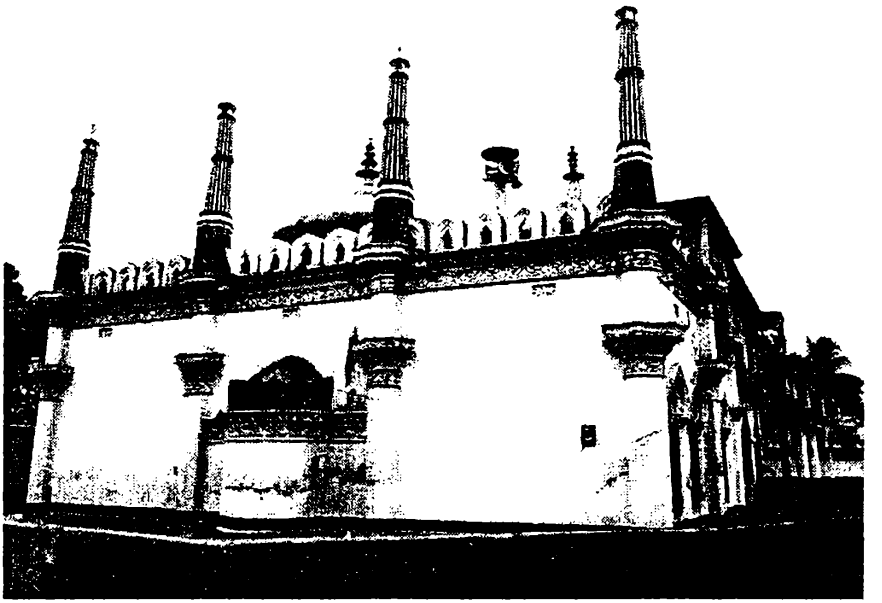

পীর শাহ নেকমরদের মাজার ও নাথগুরু গোরক্ষনাথ

বাংলার উত্তরাঞ্চলে হিন্দু রাজত্বের শেষ যুগে ভীমরাজ ও পীতরাজ নামে দু'ভাই ভবানন্দপুরের শাসক ছিলেন। তাদের শাসনামলে প্রজা সাধারণ ছিল নির্যাতিত। অনাচার, দুর্নীতি আর অরাজকতায় মানুষ ছিল অতিষ্ঠ। এমন দুঃসময়ে শেখ নাসির-উদ-দীন নেকমরদ এই রাজ্যে প্রবেশ করলেন। শেখ নাসির-উদ-দীন ছিলেন পূণ্যবান ব্যক্তি। তিনি মূলত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভবানন্দপুর আসেন। কিন্তু ভীমরাজ ও পীতরাজ কৌশলে তাঁকে বাধা দিলেন। কিন্তু পীর বাবা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তিনি অলৌকিক ক্ষমতাবলে সেই বাধা দূর করলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে অত্যাচারী দু'ভাইকে অভিশাপ দিলেন, "ও রে পাপিষ্ঠ তোরা ধ্বংস হবি।" সত্যিই কিছুদিন পর প্রবল ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হলো রাজপ্রসাদ, রাজধানী; মারা গেলো অত্যাচারী দুই ভাই। ধূলিসাৎ হওয়া রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের ওপর নির্মিত হলো পীর শাহ নেকমরদের আস্তানা। বিধ্বস্ত রাজধানীর ওপর শুরু হলো নতুন জনপদের যাত্রা।

নাথগুরু গোরক্ষনাথ এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ফকিরদের আগমনের কথা মায়া শক্তিতে জানতে পেরে উৎকণ্ঠিত হলেন। তিনি শিষ্যদের উদ্দেশ্যে পশ্চিমদিক থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে খরস্রোতা নোনা নদী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ বাধা তাঁকে আটকে রাখতে পারলো না। তিনি খড়ম পায়ে পানির

BanglaBook.org

ওপর হাঁটতে শুরু করলেন। পূর্বে কাইচা নদীর তীরে অবস্থান করছিলেন পীর শাহ নেকমরদ। তিনি দেখতে পান গোরক্ষনাথের কেরামতি। আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন পীর শাহ নেকমরদ। আর এতেই অঘটন ঘটলো। গোরক্ষনাথ নদীতে তলিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর পরনের গামছা ভিজে গেল। আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে ঘটনা জানতে পেরে গোরক্ষনাথ আর অগ্রসর হলেন না। সেখানে বালুচর সৃষ্টি করে তিনি বসে পড়লেন। বালুচরে গড়ে উঠলো নাথ আশ্রম।

অলৌকিক কেরামতিতে সাধারণ মানুষের মন জয় করলেন পীর শাহ নেকমরদ। ভবানন্দপুর হলো নেকমরদ। তবে আজও নেকমরদকে মৌজা হিসেবে ভবানন্দপুর লেখা হয়। তিনিই পীর শাহ নেকমরদ নামে খ্যাতিমান এবং এই খ্যাতিমান পুণ্যাত্মা পুরুষের কারণেই ভবানন্দপুর পরবর্তীকালে নেকমরদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

পীর শাহ নেকমরদ পহেলা বৈশাখে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পূণ্য স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে এই তারিখে পবিত্র ওরস উদযাপন ও বার্ষিক মেলার প্রবর্তন হয়। এই মেলাই হচ্ছে বিখ্যাত নেকমরদ মেলা। পীর শাহ নেকমরদের মাজার সম্পূর্ণ কাঁচা ছিল। মাজারের কারুকার্যখঁচিত চাঁদোয়া এবং জামে মসজিদটি প্রায় আশি বছর পূর্বে নির্মিত হয়।

*ইতিহাস পীর শাহ নেকমরদ ও নাথগুরু গোরক্ষনাথের সমসাময়িকতা স্বীকার করে না। গোরক্ষনাথের অনেক পরে আগমন ঘটে পীর শাহ নেকমরদের। রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদ থেকে প্রায় আট কিলোমিটার পশ্চিমে গোরকুই নামের গ্রামটির নামের সাথে নাথগুরু গোরক্ষনাথের স্মৃতি বিজড়িত। এই গ্রামে নাথ আশ্রমে পাঁচটি মন্দির ও একটি ব্যতিক্রমধর্মী অতি প্রাচীন বেলে পাথরের কূপ সংরক্ষিত রয়েছে। যা বাংলাদেশের আর কোথাও নেই।

BanglaBook.org

বেহুলা-লখিন্দরের বাসরঘর

ছয় পুত্র নিয়ে চম্পক নগরের সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাশালী বণিক চাঁদ সওদাগর তার সপ্তডিঙ্গা মাধুকর বাণিজ্যতরী নিয়ে সপ্তগ্রাম ও গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত ত্রিবেণী হয়ে সমুদ্রের পথে যাত্রা করেছেন। প্রফুল্ল চিত্তে গর্বভরে তিনি তাকিয়ে ছিলেন নীল জলরাশির পানে। পুত্ররা সাবালক হয়েছে, ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, সবই মহাপ্রভূ শিবের বদৌলতে। মনে মনে কপালে হাত ছুঁইয়ে বলেন, "জয় শিবা শম্ভু।" শিবের পরম ভক্ত চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যের জন্য এবার বেশ লাভজনক পণ্য সংগ্রহ করেছেন। লক্ষ্য সিংহল। কিন্তু আর কিছুদিনের পরেই যে দুর্ভোগ ধেয়ে আসছে, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা জন্মায়নি সওদাগরের মনে।

BanglaBook.org

জগত পিতা শিবের দরবারে সর্পদেবী মনসা এসেছেন পিতার কাছে আর্জি নিয়ে। জগত পিতা তাকে সর্পদেবী করেছেন বটে কিন্তু মর্ত্যে কখনো তার পূজো হয় না। আর মানুষের পূজাব্যতীত দেবত্ব অর্জন সম্ভব নয়। এরই বিহিত করতে শিবের কাছে মনসার আগমন। শিব বললেন, "যদি আমার পরম ভক্ত চাঁদ সওদাগর তোমার পূজো দেয় তবেই তুমি দেবত্ব পাবে নচেৎ নয়।"

চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা মধুকর তরতরিয়ে এগিয়ে চলছে ত্রিবেণীর দিকে। বাণিজ্যে এবার আশাতীত লাভ হয়েছে। বাড়ি ফেরার আনন্দে সবাই আত্মহারা। এমন সুখের সময় হাজির হলো মনসা, উদ্দেশ্য চাঁদের কাছ থেকে পূজো নেওয়া। কিন্তু, শিবভক্ত চাঁদ কিছুতেই মনসার পূজো দিতে রাজি হলো না। ওপরন্তু, দেবীকে অপমান, অপদস্থ করে বিদায় করলো।

চাঁদ সওদাগর মনসাকে প্রত্যাখ্যান করায় এবার ছলনার আশ্রয় নিয়ে চাঁদের পূজা আদায় করার চেষ্টা করলেন তিনি। চাঁদ শিবপ্রদত্ত 'মহাজ্ঞান' মন্ত্রবলে মনসার সব ছলনা ব্যর্থ করলেন। তখন মনসা সুন্দরী নারীর ছদ্মবেশে চাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তার গুপ্তরহস্য জেনে নিতে বেগ পেতে হলো না। ওদিকে চাঁদ মহাজ্ঞানের অলৌকিক রক্ষাকবচটি হারিয়ে ফেললেন। কিন্তু, এরপরেও দৃঢ়চেতা চাঁদ সওদাগর হার মানলো না বাল্যবন্ধু ধন্বন্তরীর অলৌকিক ক্ষমতাবলে নিজেকে রক্ষা করতে থাকলেন। ধন্বন্তরী চাঁদের থেকেও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। তাই এবার মনসার ছলনার জালে প্রাণ গেলো ধন্বন্তরীর। চাঁদ অসহায় হয়ে পড়লেন কিন্তু মনসার কাছে মাথা নোয়ালেন না।

এতকিছুর পরেও যখন চাঁদ সওদাগর মনসার পূজো করলেন না, ক্রোধান্বিত মনসা সর্পাঘাতে চাঁদের ছয় পুত্রের প্রাণ নাশ করলেন। ভগ্ন হৃদয়ে, মনের দুঃখে চাঁদ সওদাগর আবারো শান্তির খোঁজে সমুদ্রে বেরুলো। সফল বাণিজ্যের পর তিনি যখন ধনসম্পদে জাহাজ পূর্ণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন, তখনই মনসা প্রচণ্ড ঝড় তুলে তার সপ্তডিঙ্গা মধুকর সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলো। চাঁদ সওদাগর কোনোরকমে বাঁচলেও বাকি সবাই মারা গেলো। সর্বস্বান্ত হয়ে চাঁদ সওদাগর কোনোক্রমে সমুদ্র তীরে পৌছালে, মনসা আবারো তাকে পূজো করার অনুরোধ করলেন, চাঁদ এবারো তার অপারগতা জানায়।

ক্ষমতাশালী, ধনী বণিক চাঁদ সওদাগর পথের ফকির হয়ে ঘুরতে লাগলেন। তবুও তিনি শিবের পূজা ছাড়লেন না।

সব রকম ছলনা, অত্যাচারের পরেও যখন চাঁদ সওদাগর রাজি হলো না, মনসা তখন স্বর্গের নর্তকদম্পতি অনিরুদ্ধ-ঊষাকে মর্ত্যে পাঠালেন।

অবশেষে বহুদিন পথে পথে ঘুরে চম্পক নগরীতে পৌছুলেন চাঁদ সওদাগর। জগৎপিতা শিবের আশীর্বাদে নিজের ভগ্ন অবস্থার আবারো উন্নতি সাধন

BanglaBook.org

করলেন। যথাসময়ে তার ঘর আলো করে অনিরুদ্ধ জন্ম নিলো "লখিন্দর" হয়ে। একই সময়ে একই নগরে চাঁদের বন্ধু সয়া বেনের ঘরে উষা জন্ম নিলো "বেহুলা" নামে। অপরূপ সৌন্দর্য্য নিয়ে দু'টি শিশু বড়ো হতে লাগলো একই সাথে।

চাঁদ সওদাগর ও সয়া বেন দুই বন্ধুতে দু'জনের বিয়ের কথা চিন্তা করলেন। কিন্তু কোষ্ঠী মিলিয়ে দেখা গেলো, বিয়েররাত্রেই বাসরঘরে সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যুর কথা লেখা আছে। কিন্তু মনসার ভক্ত বেহুলা ও লখিন্দর রাজযোটক। তাই শেষ পর্যন্ত দু'জনের বিয়ে ঠিক হলো। ইতোমধ্যে ছয়পুত্র হারানো চাঁদ সওদাগর লখিন্দরের প্রাণরক্ষা করতে একটি লৌহবাসর নির্মাণ করে দিলেন। কিন্তু মনসা কৌশলে সেই লোহার বাসর ঘরে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের ব্যবস্থা করলো।

গভীর রাত। লৌহ বাসরে লখিন্দর ঘুমোচ্ছে পাশেই বেহুলা রয়েছে পাহারায়, কিছুতেই স্বামীর নাশ হতে দেবেন না। কিন্তু একসময় তন্দ্রায় তিনিও ঘুমিয়ে গেলেন। ছিদ্র পথে কালনাগিনী প্রবেশ করে বেহুলার চুল বেয়ে বিছানায় ঘুমন্ত লখিন্দরের প্রাণ নাশ করলো। সফল হলো মনসার ষড়যন্ত্র।

প্রথা অনুসারে সাপে কাটা লখিন্দরকে কলাগাছের ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হলো নদীর জলে। তবে ভেলায় শুধু লখিন্দরই নয়, তার সাথে যাত্রা করতে চাইলেন বেহুলা। লক্ষ্য তার স্বর্গ। সবার শত কাকুতি-মিনতির পরেও স্বামী লখিন্দরের সঙ্গী হলো সতীসাধ্বী বেহুলা। সে দৃঢ়চিত্তে সংকল্প করে, যে করেই হোক দেবতাদের কাছ থেকে প্রাণ ফিরিয়ে আনবেনই লখিন্দরের। দিন গেলো, রাত গেলো কাঁদতে কাঁদতে কত গ্রাম পেরুলো। এভাবেই কেটে গেলো ছয়টি মাস। অপরূপা বেহুলাকে দেখে লোকে হাসে, ঢিল ছুড়ে মারে আবার মৃত লখিন্দরকে দেখে ভয়ও পায়। অবশেষে একদিন ভেলা এসে ভেড়ে মনসার পালক মা নেতোর ঘাটে। মায়া হলো নেতোর, নিজের অলৌকিক ক্ষমতাবলে বেহুলা ও মৃত লখিন্দরকে দেবালয়ে নিয়ে গেলেন তিনি।

বাংলার সতীসাধ্বী বেহুলা নিজ নৃত্যের সাহায্যে দেবতাদের মন তুষ্ট করলে, দেবতাদের আদেশে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে রাজি হলেন মনসা। কিন্তু, শর্ত থাকে, চাঁদ সওদাগরকে রাজি করাতে হবে তার পূজো দিতে। সানন্দে রাজি হয় বেহুলা, ধীরে ধীরে পচাঁ গলা মৃত লখিন্দরের শরীরে ফিরে আসে প্রাণের স্পন্দন।

ফিরে আসা সন্তান আর পুত্রবধূর অনুরোধে মর্ত্যের প্রথম মানুষ চাঁদ সওদাগর, প্রতিমাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে মা মনসার পূজো করতে সম্মত হলেন। কিন্তু মনসা তাকে যে কষ্ট দিয়েছিলেন, তা তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারেননি। তিনি বাম হাতে প্রতিমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মনসাকে পূজা করতে থাকেন। মনসা অবশ্য তাতেই সন্তুষ্ট হন। এরপর চাঁদ সওদাগর ও তাঁর

BanglaBook.org

পরিবার সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে। চাঁদ-এর ছয় পুত্রকেও মনসা জীবন দান করলেন। শুরু হলো মর্ত্যে মা মনসার বন্দনা আর যুগ যুগ ধরে অমর রইলো বেহুল-লখিন্দরের প্রেমগাঁথা।

মহাস্থানগড়ের তিন কিলোমিটার দক্ষিণে এবং বগুড়া শহরের নয় কিলোমিটার উত্তরে বগুড়া-রংপুর সড়ক থেকে এক কিলোমিটার দূরে গোকুল মেধ নামে একটি জায়গা রয়েছে। এই জায়গাটিকে স্থানীয়ভাবে বেহুলার বাসরঘর বা লখিন্দরের মেধ বলে ডাকা হয়।

BanglaBook.org

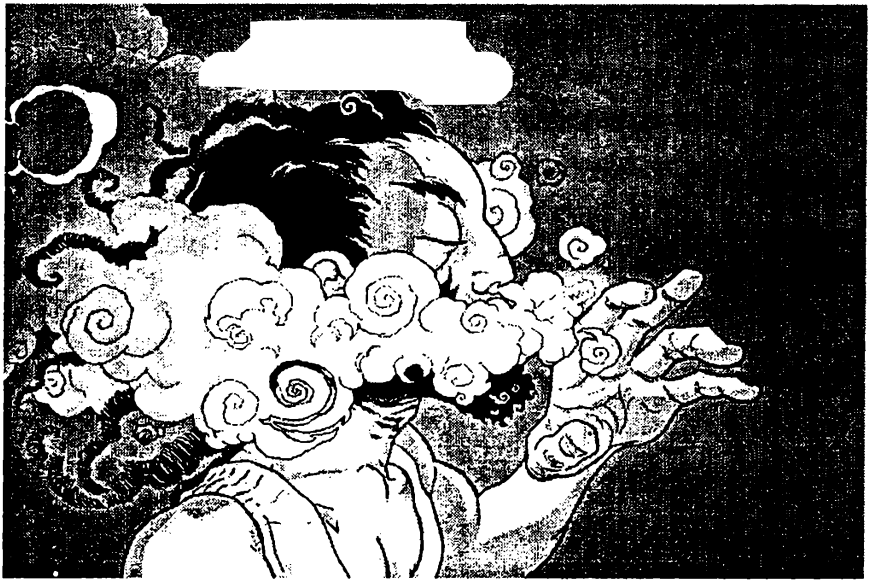

চোর চক্রবর্তীর ঢিবি

চিন্তিত চেহারায় টোলে বসে ছিলেন শিবনাথ চক্রবর্তী। তাকে ঘিরে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে এই গ্রামেরই কয়েকজন বাসিন্দা। শিবনাথ চক্রবর্তী কুলিন ব্রাহ্মণ। দেব পূজা, যজমান আর এই পিতৃদেবের স্থাপিত টোল নিয়েই দিন কাটে তাঁর। ব্রাহ্মণ বলে সব জায়গায় আলাদা সম্মান পান তিনি।

কিন্তু একমাত্র পুত্র শশীনাথের জন্য সুখ-শান্তি, মান-সম্মান সব হারাতে বসেছেন আজ। উচ্চাকাঙ্খী শশীনাথ পিতার মতো যজমান আর ঠুনঠুনে টোল নিয়ে দিন কাটাতে নারাজ। স্বপ্ন দেখে ধনী হবার, দালান-কোঠার। আর তাই বেছে নিয়েছে প্রাচীন এক বিদ্যার... চুরি বিদ্যা।

অনেক বুঝিয়ে, রাগ দেখিয়ে কিছুতেই কিছু হলো না। একদিন ব্রাহ্মণ চুরি বিদ্যায় পারদর্শী শশীনাথকে চুরি থেকে বিরত রাখতে একটি পাত্রে ছাই ও মুদ্রা দিয়ে পরীক্ষা দিলেন। শর্ত ছিল, মুখে ছাই না লাগিয়ে মুদ্রাটি বের করে আনতে হবে। কিন্তু শিবনাথের কপাল মন্দ। শশীনাথ নিজ বিদ্যা-বুদ্ধিতে জিতে যায়। চুরি করতে আর কোনো বাধা রইলো না।

ছেলের কুকীর্তিতে শিবনাথ একদিন মারা গেলেন। এদিকে চুরির টাকা দিয়ে শশীনাথ একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো। দিন বেশ ভালো কাটছিল। কিন্তু রক্তে মেশা নেশা তখন তাকে আরো বেপরোয়া করে তুলেছে। এবার হাত বাড়ালো সে ঐশ্বর্যশালী মগধে। কিন্তু কথায় আছে, "চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একদিন।"

BanglaBook.org

একদিন চুরি করতে গিয়ে মগধের সৈন্যদের তাড়া খেয়ে, অনাহারে, দিন-রাত পথ চলে নিজ প্রাসাদে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলো। সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে।

চোর চক্রবর্তীর ঢিবি বা চোর চক্রবর্তীর দুর্গ বাংলাদেশের রংপুর বিভাগে অবস্থিত একটি প্রাচীন মাটির দূর্গ। এটি মূলত দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন দুর্গ–যাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে কিংবদন্তী এই গল্প।

BanglaBook.org

কুড়িটিলার কালোপাথর

শত শত বছর আগের কথা। ৩৬০ আউলিয়ার পূণ্যভূমি সিলেটের এক প্রান্তে দিনাজপুর পরগনা। এই পরগনারই এক সুপ্রাচীন বাজারের কথা বলছি। বাজারের নাম "ইমামবাজার"। যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ের অন্যতম ব্যস্ত একটি বাজার ছিল এটি। কর্মব্যস্ত এই বাজারে অন্যসব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পাশাপাশি বাজারের এক প্রান্তে বড়ো বড়ো মাছ কেটে বিক্রি করা হতো। মাছ কাটার পর মৎস্যজীবীরা মাছের পরিত্যক্ত অংশ একটু দূরের এক ভাগাড়ে ফেলে দিতেন। আর সেসব ফেলে দেওয়া মাছের পরিত্যক্ত অংশগুলো প্রতিদিন কুড়িয়ে নিতেন সাদা পোশাক পরা স্নিগ্ধ চেহারার দরবেশের মতো এক লোক।

প্রতিদিনকার এই দৃশ্যটি আর কারো চোখে না পড়লেও, পূর্ব দেবপাড়ার সামছু মিয়া নামের জনৈক ব্যক্তি ঠিকই খেয়াল করতেন। সামছু মিয়া আবার ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত ছিল। তার এতই দাপট ছিল যে তার নাম শুনলেও মানুষ ভয়ে কাঁপতো।

প্রতিদিনকার মতো একদিন সাদা পোশাক পরিহিত দরবেশ মাছের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করছিলেন। সামছু মিয়া সেদিনও খেয়াল করছিলেন এই ব্যাপারটা। হঠাৎ কী মনে করে সামছু মিয়া ভাবলেন, আজ তিনি এই দরবেশের পিছু নিয়ে দেখবেন দরবেশ কোথায় যায় আর এই উচ্ছিষ্ট দিয়ে করেনটা কী! দরবেশের কর্মকাণ্ড ক্রমেই সামছু মিয়াকে কৌতূহলী করে তুলছিল। সামছু মিয়া দেখলেন, উচ্ছিষ্ট একটি ব্যাগে সংগ্রহ করে দরবেশটা ফিরতি পথে রওনা হয়েছেন। পূর্ব

BanglaBook.org

ভাবনা অনুযায়ী, সামছু মিয়াও উনার পিছু নিলেন।

তখন রাত নেমেছে। কুড়িটিলা পাহাড়ের সরু আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন দরবেশ। পিছু পিছু সামছু মিয়া। শান্ত নীরব প্রকৃতির মাঝে পথ চলার মৃদু শব্দ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। দরবেশ এগিয়ে চললেন কুড়িটিলা নামক এক পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের নিচে এসে আস্তে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলেন। পাহাড়ের ওপরে উঠবার পর দরবেশ একটি কালোমতো বিশাল পাথরের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর ঘটলো এক আশ্চর্য ঘটনা। পাথরটা যেন কোনো এক অদৃশ্য ইশারা পেয়ে সরে গেলো তার নিজ জায়গা থেকে। সরে যাওয়া অংশটায় দেখা গেলো একটি আলোকিত সুড়ঙ্গ পথ। তারপর দরবেশ সেই পথে প্রবেশ করলেন। তবে খোলা রেখে গেলেন সুড়ঙ্গ পথ, যেন কাউকে আসার আমন্ত্রণ করছেন!

এতক্ষণ আড়াল থেকে সবই দেখছিল সামছু মিয়া। সবকিছু দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছে। এ যে আরব্যরজনীর গল্পের মতো! সামছু মিয়া দরবেশের পিছু নেবে কিনা এই দোনোমনা করতে লাগলেন। অবশেষে কৌতূহলের কাছে হার মানলো ভয়। সামছু মিয়াও সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করলেন। এবার সামছু মিয়া হতভম্ব হয়ে গেলেন। একি দেখেছেন তিনি! এ তো রীতিমতো রাজপ্রাসাদ! কী অদ্ভুত সুন্দর চারপাশ। বাতাসে ভাসছে অপার্থিব সুন্দর অজানা সুঘ্রাণ। অদূরেই বসে আছেন, সাদা পোশাক পরিহিত সাত জনের একটি সুসজ্জিত দল। পাশেই রাখা খাবারের বিশাল আয়োজন।

সামছু মিয়া দেখলেন, তিনি যে দরবেশের পিছু নিয়েছিলেন ঐ দরবেশকে ঘিরে বসে আছেন বাকি সব দরবেশ। তিনি তার ব্যাগ থেকে বের করছেন নানান মুখরোচক খাবার। সামছু মিয়ার এবার আরেক দফা অবাক হওয়ার পালা। কারণ তিনি নিজ চোখে দেখেছেন দরবেশ তার ব্যাগে শুধু মাছের উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করেছিলেন অথচ ব্যাগ থেকে এত বাহারি খাবার আসছে কীভাবে? এও কি সম্ভব!

সব খাবার বের করার পর দরবেশ ৮টি খাবারের থালা বের করলেন। এটা দেখে বাকি ছয়জন দরবেশ অবাক হলেন। একজন শুধালো, "জনাব, আমরা তো মাত্র সাতজন আছি, তাহলে খাবারের থালা আটটি কেন?"

প্রথম দরবেশ রহস্যময় স্মিত হেসে উত্তর দিলেন, "বন্ধুরা, আজ আমাদের এক সম্মানিত মেহমান আছেন। তিনি আজকে আমাদের সাথে খাবার গ্রহণ করবেন। আমি সম্মানিত অতিথিকে আমাদের সাথে খাবার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

দরবেশের কথা শুনে সামছু মিয়া বুঝতে পারলেন কথাগুলো তার উদ্দ্যেশ্যেই বলা। সামছু মিয়া ভয়ে ভয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দরবেশদের

BanglaBook.org

সাথে খাবার গ্রহণ করলেন। সে খাবার এতই সুস্বাদু যে সামছু মিয়ার মনে হচ্ছিল তার সারাজীবনে তিনি এত সুস্বাদু খাবার কখনো খাননি। খাবার শেষে চরম তৃপ্তি অনুভব করে সামছু মিয়া।

এদিকে রাত গভীর হতে চলেছে। সামছু মিয়ার বাড়ি ফেরা দরকার। সে বাড়ি ফেরার কথা জানালো দরবেশদের। দরবেশরা তাকে সুড়ঙ্গ পথের প্রবেশমুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। সেই সাথে বারবার সতর্ক করে বললেন, "সামছু মিয়া, তোমার যখনই ইচ্ছা হবে তুমি এখানে আসতে পারবে। কিন্তু আমাদের এই আস্তানার কথা কাউকে বলতে পারবে না, বললে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।"

এদিকে, বাড়িতে ফিরে সামছু মিয়া গভীর চিন্তায় পড়ে। কী থেকে কী যে হয়ে গেলো! তার মধ্যে একটা কমনীয় ভাব চলে আসে। ডাকাতি ছেড়ে সারাদিন বাড়িতে বসে থাকতে লাগলো। পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় শুরু করলো। তার এই পরিবর্তনে গোটা এলাকায় সাড়া পড়ে যায়। এলাকাবাসী প্রতিনিয়ত জানতে চাইতো, সামছু মিয়ার হলোটা কী। একদিন সামছুর বৃদ্ধ মা, চেপে ধরে সামছুকে। আজ তাকে সব খুলে বলতেই হবে। না বলে নিস্তার নেই আজ। সবার চাপের মুখে সামছু মুখ খুলতে বাধ্য হয়। সে সব খুলে বলে তাদের। এবং এটাও বলে দেয় যে, এই ঘটনা বলার কারণে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এবং সত্যি সত্যি তিন দিনের ভেতর মারা গেলো সামছু মিয়া।

সামছু মিয়ার মুখ থেকে এই ঘটনা শুনে এক লোভী লোক কুড়িটিলায় গিয়েছিল সেই আস্তানার খোঁজে। কিন্তু কোথায় সেই সুড়ঙ্গ! কোথায় কী! লোকটি শুধু একটি বিশাল কালো পাথর দেখতে পেলো। রাগে, হতাশায় লোকটি তার হাতে থাকা কুড়াল দিয়ে পাথরে একটি আঘাত করলো। ঠিক তিন দিনের মধ্যে এই লোকটিও মৃত্যুবরণ করলো।

কিংবদন্তী এই কালো পাথরটি আজও টিকে আছে। শুধু তাই ই নয় প্রায় এক শ বছর আগে এই পাথরের আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ও প্রস্থে ৫ ফুট। দিন দিন পাথরটির আকার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বর্তমানে কালো পাথরটির আয়তন, দৈর্ঘ্যে ১৬ ফুট ও প্রস্থে ১১ ফুট।

BanglaBook.org

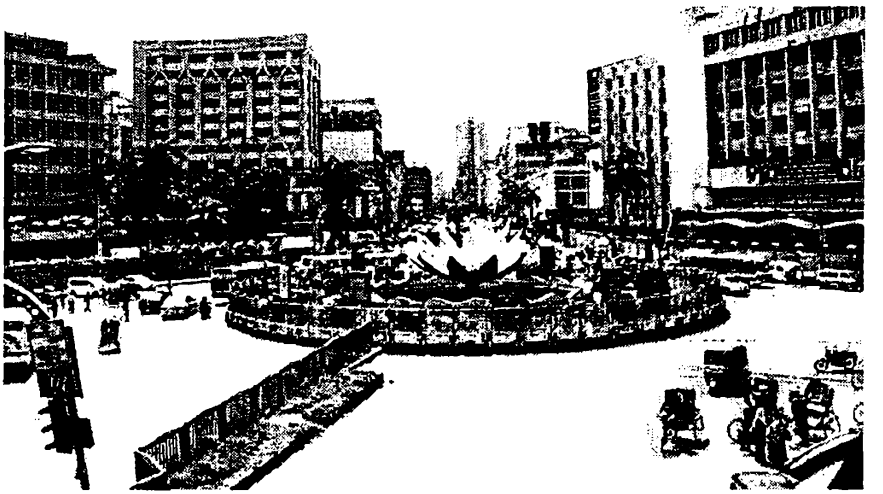

নামের কিংবদন্তী (অভ্যন্তরীণ ঢাকা)

রাজধানী ঢাকার বুক চিরে বয়ে গেছে কত রাজপথ, রয়ে গেছে ইতিহাসের পদচিহ্ন। ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থিত একটি মন্দির। **ঢাকার** নামকরণ হয়েছে "ঢাকার ঈশ্বরী" অর্থাৎ ঢাকা শহরের রক্ষাকর্ত্রী দেবী হতে।

কিন্তু কখনো কি মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই জায়গাটার নাম এমন কেন? তবে সবচেয়ে মজার ও চমকপ্রদ নামগুলো হচ্ছে পুরান ঢাকার। তারমধ্যে কয়েকটি এলাকা ও রাস্তা নামকরণের গল্প বলা যাক।

ঢাকা শহরের **শাঁখারীবাজার**-এর নাম সবার জানা। কিন্তু আমরা কি তলিয়ে দেখেছি, কেমন করে এই স্থানের নাম হলো শাঁখারীবাজার? কিংবদন্তী অনুসারে, বাংলাদেশে শাঁখারী সম্প্রদায় প্রথম এসেছিল বিক্রমপুরে, বল্লাল সেনের সঙ্গে। সে সময় 'শাঁখারীবাজার' নামে বিক্রমপুরেও একটি বাজার ছিল। সেই বাজারের স্মৃতি বহন করছে আজকে ঢাকার এই শাঁখারীবাজার! মোগলরা ঢাকায় আসার পর বিক্রমপুরের শাঁখা প্রস্তুতকারক সম্প্রদায়কে জমিজমার লোভ দেখিয়ে নতুন গড়ে ওঠা এ শহরে নিয়ে আসেন তিনি। তারা ঢাকার যে অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করলেন, সেটিই এখন শাঁখারীবাজার। কিন্তু, মজার ব্যাপার হলো ঢাকার শাঁখারীবাজার এখনো বহন করছে বিক্রমপুরের শাঁখারীবাজারের স্মৃতিময় নামটি।

গেন্ডারিয়ার কিংবদন্তী হলো বর্তমানের ঢাকার এই অঞ্চলটির জায়গায় একসময়

BanglaBook.org

সেখানে ছিল ঘন জঙ্গল। উনিশ শতকের শেষ দিকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, অনেক আগে এখানে প্রচুর গেন্ডারি বা আখের চাষ হতো। বলেই নাকি এলাকাটির নাম হয়েছে গেন্ডারিয়া।

বেশির ভাগ মানুষের ধারণা ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানার্থে **ইন্দিরা রোড**'র নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু সড়কটির ইতিহাস আরো পুরোনো। কিংবদন্তী আছে এককালে এ এলাকায় দ্বিজদাস বাবু নামে এক বিত্তশালী ব্যক্তি বসবাস করতেন। তার ছিল বিশাল বাড়ি। বাড়ির কাছের এই রাস্তাটি তার বড়ো মেয়ে ইন্দিরার নামে ধীরে ধীরে পরিচিত হতে থাকে। একসময় এটি হয়ে যায় **ইন্দিরা রোড**।

ঐশ্বর্যশালী বাংলা ছিলো সব শাসনামলেই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ছিলো ইংরেজ শাসনামলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রসদভাণ্ডার। কিন্তু ইংরেজরা এদেশে আসার অনেক আগে থেকেই যাতায়াত, মালামাল পরিবহন ও যুদ্ধের কাজে প্রচুর হাতি ব্যবহার হতো। বন্য হাতিকে পোষ মানানো হতো একটি নির্দিষ্ট জায়গায়। এই জায়গাগুলোকে বলা হতো পিলখানা। সে সময় ঢাকায় একটি বড়ো সরকারি **পিলখানা** ছিল। সরকারি কাজের বাইরেও ধনাঢ্য ঢাকাবাসীরা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি দিয়ে তাদের হাতিগুলোকে এখানে পোষ মানানোর জন্য পাঠাতে পারতেন।

একটা সময় ঢাকার বেশিরভাগ অঞ্চলই ছিলো বিস্তৃর্ণ ফাঁকা এলাকা। খুব বেশিদিন আগে নয়, তৎকালীন নির্মানাধীন সংসদ ভবনের পাশের খেতবাড়িতে চাষ হতো ধানের। তেমনই ঠিক পিলখানার হাতিগুলোকে বর্তমান রমনা ময়দানে চড়ানো হতো। গোসল করানো হতো পাশের ডোবা পুকুরগুলোতে। যে রাস্তা দিয়ে পিলখানার হাতিগুলোকে রমনার মাঠে আনা নেওয়া করা হতো সে রাস্তাটাই, ইংরেজদের দৌলতে আজকের **এলিফ্যান্ট রোড**।

উনিশ শতকের শেষ দশকে ঢাকার কমিশনার ছিলেন মি. ককরেল। সম্ভবত তার নামে সে এলাকায় কোনো রাস্তা ছিল। সে সময় ইংরেজ কমিশনারদের নামে রাস্তার নামকরণ করার রেওয়াজ ছিলো। যেমন ছিলো **"জনসন রোড" "ইংলিশ রোড"**। সেই রকম *ককরেল রোড* থেকে কালক্রমে এলাকার নাম হয়ে গেলো **কাকরাইল**।

ইংরেজ শাসনামলে কাগজ তৈরি করা হতো ঢাকায়। এই কাগজ তৈরিতে কাজ

BanglaBook.org

করতো অসংখ্য কারিগর। যারা কাগজ তৈরি করতেন তাদের বলা হত 'কাগজী'।

ইংরেজ সরকার কাগজীদের জন্য আলাদা থাকার জায়গা নির্ধারণ করেছিলেন। ধীরে ধীরে একসময় এই কাগজীরা যে এলাকায় বাস এবং কাগজ উৎপাদন ও বিক্রি করতেন সে এলাকা **কাগজীটোলা** নামে পরিচিতি লাভ করে।

ঢাকার গোপীনাগ নামের এক ধনী বণিকের বাস ছিলো। দেবতার স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি স্থাপন করলেন 'গোপীনাথ জিউর মন্দির'। তখন থেকেই এই এলাকার নাম হলো **গোপীবাগ**।

বিড়ি সিগারেটে যুগ তখনও শুরু হয়নি। তেমনি বাংলা মুলুকে হুক্কা বা গড়গড়া ছিলো অভিজাত ও মেহমানের সম্মান রক্ষার্থের সম্বল। হুক্কার "টিকা" ছিলো অপরিহার্য। আর তাই হুক্কার 'টিকা' তৈরির জন্য গড়ে উঠেছিল কর্মস্থল। কর্ম দক্ষতায় এরা ছিলো বিখ্যাত ও নিখুঁত। 'টিকা' তৈরিকারকরা এই এলাকায় বাস করতে করতে এলাকাটির নাম হয় **টিকাটুলি**।

তোপখানা নামটার সাথে সাথে কেমন জানি যুদ্ধ যুদ্ধ একটা ঘ্রাণ পাওয়া যায়। তোপ হচ্ছে বর্তমান কামান। তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোলন্দাজ বাহিনীর অবস্থান ছিল এখানে। সুতরাং তাদের সাথে ছিলো প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ। আর তাই কালক্রমে এর নাম হলো **তোপখানা**।

সতেরো শতকে ঢাকার বুক চিরে আরেকটি নদী বয়ে চলেছিল, নাম–পাগলা। মীর জুমলা নদীর ওপর সুন্দর একটি পুল তৈরি করেছিলেন। অনেকেই সেই দৃষ্টিনন্দন পুল দেখতে আসতো। ব্যস, লোকমুখে জায়গাটির নাম হলো **পাগলাপুল**।

প্রাচীন ও মধ্যে যুগে এবং করে মোঘল ও ইংরেজ শাসনামলে ঢাকায় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তেমনই একটি শিল্প হলো টিন-ফয়েল। যারা টিন-ফয়েল তৈরি করতেন তাদের বলা হত পান্নিঅলা। পান্নিঅলারা যেখানে বাস করতেন সে এলাকাকে বলা হত পান্নিটোলা। পান্নিটোলা থেকে **পানিটোলা**।

নদ-নদীর দৌলতে, বাংলার অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হতো জলপথে। এরই প্রয়োজনে তৈরি হতো বিভিন্ন ধরনের ডিঙি, নৌকা, জলযান। মোঘলরা ঢাকাকে বাংলার রাজধানী করলে এখানে গড়ে ওঠে জলযান তৈরির

BanglaBook.org

কারখানা। যারা এই কাজ করতো নামের বলা হতো সূত্রধর। ধীরে ধীরে তাদের নিয়ে গড়ে উঠলো গ্রাম। সূত্রধর থেকে, নাম হলো **সূত্রাপুর**।

১৮৭৮ সালে ঢাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হয়। এর আগে কিছু লোক টাকার বিনিময়ে চামড়ার ব্যাগে করে শহরের বাসায় বাসায় বিশুদ্ধ খাবার পানি পৌঁছে দিতেন। এ পেশাজীবিদেরকে বলা হত 'ভিস্তি' বা 'সুক্কা'। ভিস্তি বা সুক্কারা যে এলাকায় বাস করতেন সেটাই কালক্রমে **সিক্কাটুলি** নামে পরিচিত হয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

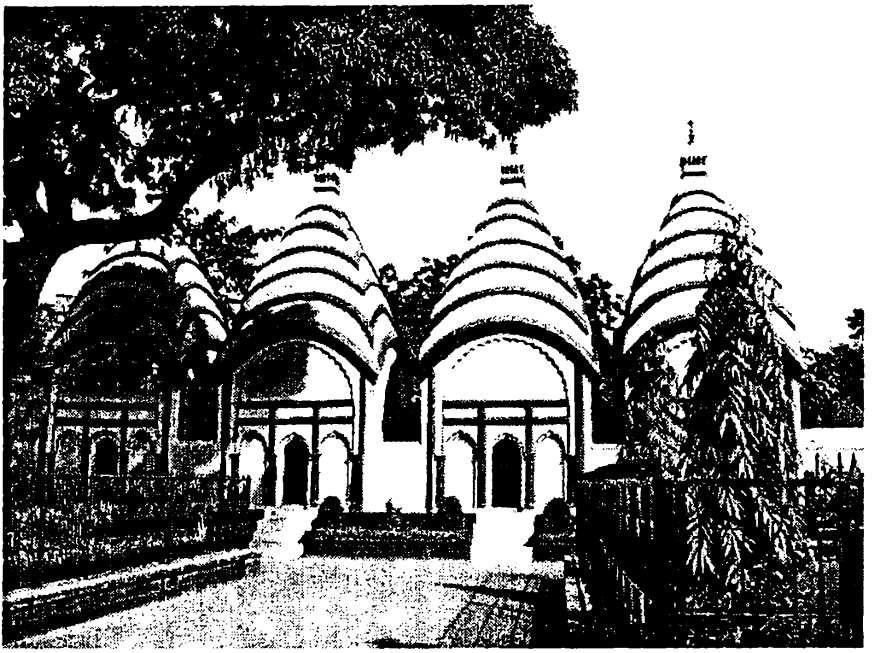

ঢাকার ঈশ্বরী–ঢাকেশ্বরী

রাজা বিজয় সেনের বিশ্রাম কক্ষ। হাতির দাঁতের তৈরি পালঙ্কে বিজয় সেন প্রসন্নচিত্তে শায়িত আছেন। শিয়রে দাঁড়িয়ে পট রাণী সূর বংশীয় রাজকন্যা বিশালদেবী। রাজা বিজয় সেন আজ পুরোপুরি কাঁটা মুক্ত হলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর এসেছে আরকানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের। পিছু হটেছে আরকানিরা। আজকের এই বিজয়ে পিতা হেমন্ত সেনের প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র সেন রাজ্যকে তিনি পরাক্রমশালী সম্রাজ্যে পরিণত করলেন। রাজার প্রসন্ন ভাব লক্ষ করে পট্টরাণী বললেন, "প্রিয়, বাংলায় আপনার চূড়ান্ত বিজয় ঘটেছে, এবার আমার মানত পুরণ করতে আজ্ঞা দিন। আমি লাঙ্গলবন্দের পুণ্য জলে স্নানে যেতে চাই মহারাজ।"

রাজা বিজয় সেন, রাণীর স্ফীত পেটের দিকে তাকিয়ে, অনাগত সন্তানের মঙ্গল কামনায় অনুমতি দিলেন লাঙ্গলবন্দ যাত্রার।

পূণ্যস্নান শেষে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে লাঙ্গলবন্দ থেকে নদীয়ায় ফেরার সময় রাণীর প্রসব বেদনা উঠলো। মহারাজ আদেশ দিলেন, শিবির স্থাপনের। শিবিরে, কোলাহলে পূর্ণ হয় জঙ্গলঘেরা প্রান্তর। ধাত্রীদের আনা-গোনায় ব্যস্ত হয়ে উঠে পট্টরাণী বিশালদেবীর শিবির।

BanglaBook.org

রাতের শেষ প্রহরে উৎকণ্ঠিত বিজয় সেনের কানে ভেসে আসে ভূমিষ্ঠ শিশুর কান্নার মধুর ধ্বনি। তিনি এগিয়ে যান সদ্য পৃথিবীতে আগত সন্তানকে কোলে নিতে। ধাত্রী কাপড়ের পুটলীতে জড়ানো পুত্রকে এগিয়ে দেন বাবার দিকে। অনিন্দ্যসুন্দর ভবিষ্যত রাজার নাম রাখলেন "বল্লাল সেন"।

এরপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। বাংলায় সেনবংশের শাসন আরো দৃঢ় হয়েছে। শক্ত হাতে দমন হয়েছে বিদ্রোহ। রাজকুমার বল্লাল সেনের হাতে রাজসিংহাসন অর্পণ করে বিজয় সেন পূজাপাঠ নিয়ে থাকেন। সিংহাসনে উঠার পর, বল্লাল সেন নিজ গুণে দেশের আরো ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করলেন। তিনি ছিলেন পিতার মতোই পরাক্রশালী।

একদিন বল্লাল সেন ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন, ঘন অরণ্যে আচ্ছাদিত অপরূপ এক দেবী মূর্তি। দেবি তাকে বললেন, "হে পুত্র! আমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করো, এই ভূমিতে, যেখানে তুমি জন্মেছ।" বল্লাল সেন স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী জঙ্গলে স্বপ্নাদিষ্ট দেবীকে আবিষ্কৃত করলেন। এটি ছিলো দেবী দুর্গা বা আদি পরামহাশক্তির একটি মূর্তি বা রূপ।

বল্লাল সেন দেবীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করতে একটি মন্দির নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। মূর্তিটি ঢাকা ছিল বলে এর নাম হলো ঢাকেশ্বরী।

একই সাথে, এর আরেকটি কিংবদন্তী রয়েছে, তা হলো...

সতীর পিতা রাজা দক্ষ জামাতা শিবকে কখনো মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। একবার দক্ষ রাজা এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন এবং সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানালেন। এতে দক্ষ রাজের কন্যা সতী পতি শিবের অপমান সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করলে শোকে মুহ্যমান মহাদেব সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন। তখন বিশ্ব চরাচর ধ্বংসের উপক্রম হয়। তখন নারায়ণ সুদর্শন চক্র সহযোগে সতীর দেহ খণ্ড করতে থাকেন, এভাবে সতীর দেহ ৫১টি খণ্ডে পরিণত হয়ে পৃথিবীর নানাস্থানে পতিত হয়। এই প্রতিটি স্থানকে এক একটি সতী পীঠ বলে, সতীদেহের উজ্জ্বল কৌরিটের 'ডাক' তথা উজ্জ্বল গয়নার অংশ বিশেষ এ স্থানে পতিত হলে এই স্থানের নাম হয় ঢাকা।

ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির হলো ঢাকেশ্বরী। বলা হয়ে থাকে এর নামকরণ হয়েছে 'ঢাকার ঈশ্বরী' অর্থাৎ ঢাকা শহরের রক্ষাকর্ত্রী দেবী হতে। প্রায় ৮০০ বছরের পুরোনো এই মন্দিরটির ইতিহাসে কিংবদন্তীই ভরসা। কারণ, সময়কাল বল্লাল সেনের শাসনামলই নির্দেশ করে। আবার কিংবদন্তী এটাও বলে, মন্দিরের মূল বিগ্রহটি দেশভাগের সময় ভারতে চলে যায় এবং সেটি ওখানেই আছে।

BanglaBook.org

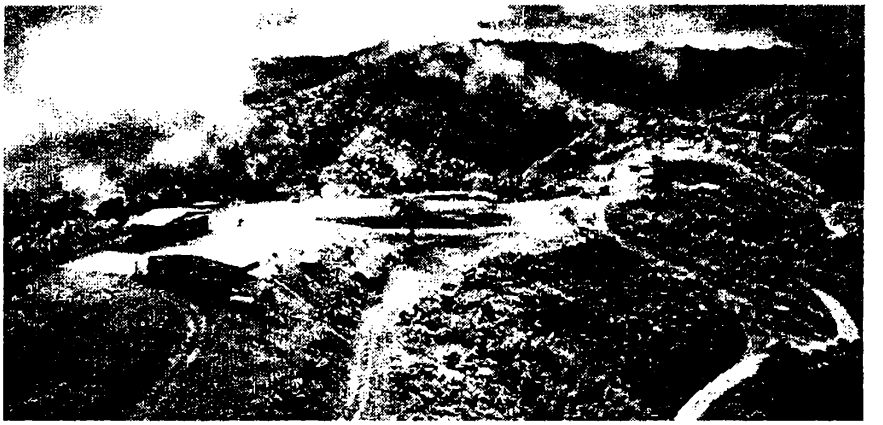

কিংবদন্তীর বান্দরবান

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের শহর বান্দরবান।

এছাড়া বাংলাদেশের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ তাজিংডং এবং বৃহত্তম পর্বতশৃঙ্গ কেওক্রাডং এই বান্দরবান জেলাতেই অবস্থিত। প্রকৃতির বৈচিত্রময় সৌন্দর্যের পাশাপাশি এখানে নানা উপজাতির বসত।

নয়নাভিরাম পাহাড়, বনাঞ্চল, হ্রদ আর সুমিষ্ট পানির ঝর্ণার লীলাভূমির, এহেন অদ্ভূত নাম কেন!

বান্দরবান জেলার নামকরণ নিয়ে রয়েছে একটি কিংবদন্তী। এলাকার বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করলেই শোনা যায়, বান্দরবানের কিংবদন্তী।

অনেক বছর আগে এই এলাকার বনাঞ্চলে একসময় বাস করত অসংখ্য বানর। এই বানরের দল শহরের প্রবেশ মুখে ছড়ার পাড়ে পাহাড়ে প্রতিদিন লবণ খেতে আসত।

একবার অনবরত বৃষ্টির কারণে ছড়ার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বানরের দল ছড়া (ঝর্ণা) পার হয়ে পাহাড়ে আসতে পারলো না। অনেকক্ষণ শলাপরামর্শ করে তারা একে অপরকে ধরে ধরে সারিবদ্ধভাবে ছড়া পার হতে লাগলো। স্থানীয় মানুষ বানরদের এই বুদ্ধিদীপ্ত ছড়া পারাপারের দৃশ্য দেখতে পেলো।

এই সময় থেকে উপজাতিরা এই জায়গাটিকে পরিচিতি "ম্যাঅকছি ছড়া" নামে ডাকতে লাগলো। অর্থাৎ মার্মা ভাষায় *ম্যাঅক* অর্থ বানর আর *ছি* অর্থ বাঁধ। কালের প্রবাহে বাংলা ভাষাভাষীর সাধারণ উচ্চারণে এই এলাকার নাম রূপ লাভ করে বর্তমান বান্দরবান হিসাবে। বর্তমানে সরকারি দলিল পত্রে বান্দরবান হিসাবে এই জেলার নাম স্থায়ী রূপ লাভ করলেও, মার্মা ভাষায় বান্দরবানের নাম "রদ ক্যওচি ম্রো"।

BanglaBook.org

বগালেকের ড্রাগন

এখন যেখানে দেখা যায়, কেওক্রাডং পাহাড়। তার পাশেই ছিলো বিস্তৃত উচুঁ নিচু আরো অনেকগুলো পাহাড়। কিন্তু, সেখানে সুমিষ্ট পানির হ্রদ কীভাবে এলো! অনেকগুলো দিন পেছনে ফেরা যাক...

পাহাড় সারির পাদদেশেই একটি ছোট্ট গ্রাম। বাসিন্দারা সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে চড়ে বেড়ায়। খাদ্য ও আয়ের উৎস এই পাহাড়ে, ওদের কাছে দেবতার মতো। নিরুদ্দেক দিন কাটে বাসিন্দাদের। কিন্তু, একদিন আকাশ থেকে নেমে এলো আজব প্রাণী। লম্বা গলার ড্রাগনের মতো দেখতে প্রাণীটি কীভাবে এখানে এলো কেউই ভেবে পেলো না। প্রাণীটি নানা অলৌকিক কাণ্ড ঘটানো শুরু করলো। লম্বা গলার আজব প্রাণীটিকে বাসিন্দারা ডাকতে শুরু করলো বগা। গ্রামটির পাশে একটি পাহাড়ের গুহায় আস্তানা বানিয়ে থাকতে শুরু করলো বগা। অদ্ভূতুড়ে প্রাণীকে কেউ ভাবলো দৈত্য-দানো, কেউ বা ভাবতে লাগলো পাহাড় দেবতা। কিন্তু, সবাই অলৌকিক শক্তির অধিকারী বগাকে খুশি করতে নিয়মিত নানা ধরনের জীবজন্তু উপহার দিতে থাকলো।

BanglaBook.org

কিছুদিন শান্তিতেই দিন কাটে গ্রামবাসীর। কিন্তু হঠাৎ একদিন গ্রাম থেকে হারিয়ে গেলো একটি শিশু। একে একে আরো হারাতে শুরু করল শিশুরা। সবাই বুঝতে পারলো কাজটা বগার। সবাই মিলে শলাপরামর্শ করে প্রতিবেশী গ্রামগুলো থেকে বেছে বেছে সাহসী জওয়ানদের নিয়ে গঠন করলো একটা দল। তারপর তীর, ধনুক, বল্লম, লাঠি আর মশাল নিয়ে রাতের অন্ধকারে তারা হানা দিল গুহায়। গুহার মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষের রক্ত আর হাড়গোড় দেখে তারা বুঝে নিল কী ঘটেছে। একসঙ্গে বগার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যুবকরা। তুমুল লড়াই হলো কিন্তু কোনো জাদুবিদ্যা দেখানোর আগেই বগা হলো কুপোকাত। কষ্টে শিষ্টে নিজের রথে চড়লো পালানোর উদ্দেশ্যে।

কিন্তু মরিয়া যুবকেরা আগুন ধরিয়ে দিল সেই রথে। সেই আগুনে পুড়ে মরল বিশালদেহী বগা। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে থর থর করে কেঁপে ওঠলো গুহা। ভেঙে পড়ল পাহাড়। সৃষ্টি হলো বিশাল এক গর্তের। পাতাল থেকে কলকল শব্দে দেখতে দেখতে ভরে উঠলো গর্তটা। জলপূর্ণ গর্তটাই নাম নিলো বগা হ্রদ যার অন্য নাম ড্রাগনের হ্রদ।

প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি বগা লেক। বগা লেকের আসল নাম বগাকাইন হ্রদ যা স্থানীয়ভাবে বগা লেক নামে পরিচিত। বগা লেক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উচ্চতার স্বাদু পানির একটি হ্রদ।

বান্দরবান শহর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে বগা লেকের অবস্থান কেওক্রাডং পর্বতের গা ঘেষে, রুমা উপজেলায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২,৪০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই লেক ফানেল বা চোঙা আকৃতির। আরেকটি ছোটো পাহাড়ের চূড়ায় বগা লেকের গঠন অনেকটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মতো।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে, বগা লেক হয় মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ নয়তো মহাশূন্য থেকে উল্কাপিণ্ডের পতনের কারণে এর সৃষ্টি। এর পানি অম্লধর্মী। কোনো জলজ প্রাণী এখানে বাঁচতে পারে না। বাইরের কোনো পানি এখানে ঢুকতেও পারে না, আবার এর আশপাশে নেই পানির কোনো দৃশ্যমান উৎস।

অলৌকিক সৌন্দর্যের বগা লেক নিয়ে রয়েছে রহস্য আরো। আশেপাশে পানির কোনো উৎস না থাকলেও এই বিশাল জলরাশির সৃষ্টি এক রহস্য বটে। তার চেয়েও বড়ো রহস্য হচ্ছে পানির রং পরিবর্তন। প্রতিবছর রহস্যময়ভাবে বগা লেকের পানির রং কয়েকবার পাল্টে যায়। যদিও কোনো ঝর্না নেই তবুও লেকের পানি পরিবর্তন হলে আশপাশের লেকের পানিও পরিবর্তন হয়। অনেকের ধারণা আন্ডার গ্রাউন্ড রিভার-এর কারণ। কেউ কেউ আবার মনে করে থাকেন এর তলদেশে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। এই প্রস্রবণ থেকে পানি বের হওয়ার সময় হ্রদের পানির রং বদলে যায়।

BanglaBook.org

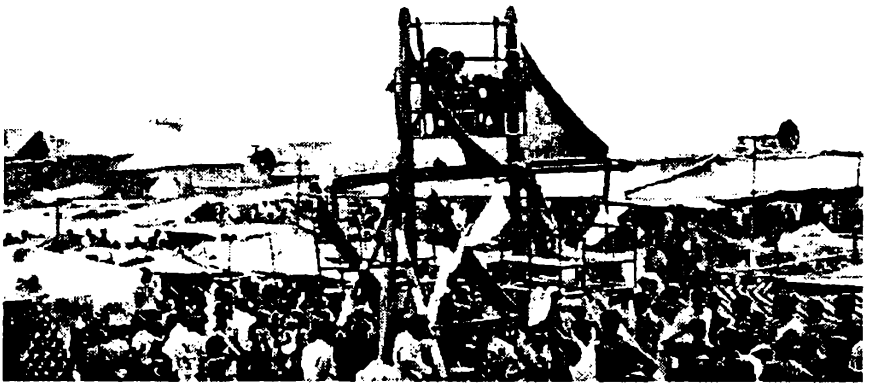

গুড়পুকুরের মেলা

পলাশপোলে একটি গোলাকৃতির পুকুরের পাড়ে বট গাছের নিচে এক ক্লান্ত পথিক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

অনেক পথ হেঁটেছেন আজ, ক্লান্তিতে পা আর উঠতে চায় না। শেষ ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমে মিইয়ে এসেছে সমস্ত শরীর। ওই যে গৌরদের পুকুরপারের বটগাছটা ওর ছায়ায় একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। বটের ছায়ায় বসতে না বসতেই ঘুম এসে গেল ফাজেলের। ফসল বেঁচা টাকার বোঁচকাটা ট্যাঁকে গুঁজে শেকড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। গাছতলার ঘুম। গাছতলার রোদ্দুরের মতই ছেঁড়া ফাটা নড়বড়ে। বটের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের তীব্র রশ্মি এসে পড়লো ফাজেলের মুখে। ঘুম ভেঙে যেতে লাগলো। অস্বস্তিবোধ করলেন তিনি। মগডালে বসেছিল এক পদ্মগোখরো সাপ। সে তা লক্ষ করে নেমে এলো নিচে, যে পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মি এসে ফাজেলের মুখে পড়েছে ঠিক সেখানে। ফণা তুলে দাঁড়ালো সাপটা। ফণার ছায়া এসে পড়লো ফাজেলের মুখে। তিনি আরাম পেয়ে আবারও ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার পর আবার ঘুম ভেঙে গেলো। এর মধ্যে ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়ে গেছে। বটের পাতায় পাতায় দৃষ্টি ঘোরাতে লাগলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন সেই সাপটিকে। তখনও সে ফণা তুলে সূর্যকে আড়াল করে আছে। এবার ফণাটা একটু দুলে উঠলো, দুলে উঠলো গাছের পাতা। তখন তার চোখে ঘুমের রেশমাত্র নেই। ভয় পেয়ে যায় ফাজেল। নির্জন গাছপাড়ে সাপটা এলো কীভাবে! কিন্তু শরীরে নেই একবিন্দু ক্লান্তি। সাপটার কর্মকাণ্ডে অবাক হলো ফাজেল। এমন সময়, সে দৈববাণী শুনলো, "সবাইকে

BanglaBook.org

বল এখানে আমার পূজো দিতে।" ফাজেল পড়িমরি করে ছুটলো গ্রামের দিকে। সবাইকে ডেকে খুলে বললো সবকিছু।

তারপর থেকেই বটতলায় শুরু হলো মা মনসার পূজো। পূজোর নৈবদ্য ভাসিয়ে দিতে কাটা হলো পুকুর। কিন্তু পুকুরটিতে পানি থাকত না বেশিদিন; পরে স্বপ্নে দেখা গেলো পুকুরে ১০০ ভাড় গুড় ঢালতে হবে। স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী কাজ করার ফলেই পুকুরে পানি এলো। সেই যে পুকুরে পানি এলো আর শুকালো না। তাই এর নাম হলো গুড় পুকুর।

লৌকিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস আর পৌরাণিকতায় সমৃদ্ধ সাতক্ষীরা। নানা কিংবদন্তীর প্রবাহমান ধারায় সজীব এখানকার ঐতিহ্য। বঙ্গোপসাগরের আঁচল ছোঁয়া সুন্দরবন, আর সুন্দরবনকে বুকে নিয়ে সমৃদ্ধ এখানকার প্রকৃতি, এমনি অর্থনীতিও। সুন্দরবনের চোখ জুড়ানো চিত্রল হরিণ, বিশ্ববিখ্যাত ডোরাকাটা বাঘ থেকে শুরু করে বনদেবী, রাজা প্রতাপাদিত্যের জাহাজঘাটা, বিভিন্ন মোঘলীয় কীর্তি, অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পুরাকালের কাহিনি, জারি-সারি, পালাগান, পালকি গান এসবের মধ্যেই সাতক্ষীরার মানুষের আত্মিক পরিচয় গ্রন্থ। এখানে জন্মেছেন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সুফী দরবেশসহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, জন্মেছেন জীবন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ সাহসী মানুষ। শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূখর আত্মত্যাগী বীর।

গ্রামবাংলার লোকজ ঐতিহ্যই এখনো পর্যন্ত সাতক্ষীরার সংস্কৃতির মূলধারাটি বহন করে চলেছে। খুব সহজেই এখানে মিলিত হয়েছে লৌকিক আচার-আচরণের সাথে পৌরাণিকত্বের। যেন দুটো নদীর সম্মিলিত এক বেদবান ধারা। বছরের প্রায় প্রতিটি সময়ধরে অগণিত মেলা বসে সাতক্ষীরায়। সাগরদ্বীপ দুবলোর মেলা থেকে শুরু করে খুলনা, যশোর এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত। এ জেলার শুধু নয়, দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো মেলাটি বসে সাতক্ষীরা শহরেই, গল্পে বলা পলাশপোল, গুড়পুকুরের পারে। প্রতিবছর বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে ভাদ্র মাসের শেষদিনে অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মনসা পূজা। এই পূজাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় মেলা। তবে নামানুসারেই মেলার নামকরণ করা হয়েছে গুড়পুকুরের মেলা। মেলাটির বয়স এখনও ঠিকভাবে জানা যায়নি।

তবে ঐতিহাসিক আবদুস সোবহান খান চৌধুরীর মতে, চৌধুরীপাড়ার রায় চৌধুরীরা গৌরবর্ণের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাদের খননকৃত পুকুরটি নাম ছিলো "গৌরদের পুকুর" যা কালক্রমে রূপ লাভ করে গুড়পুকুর।

BanglaBook.org

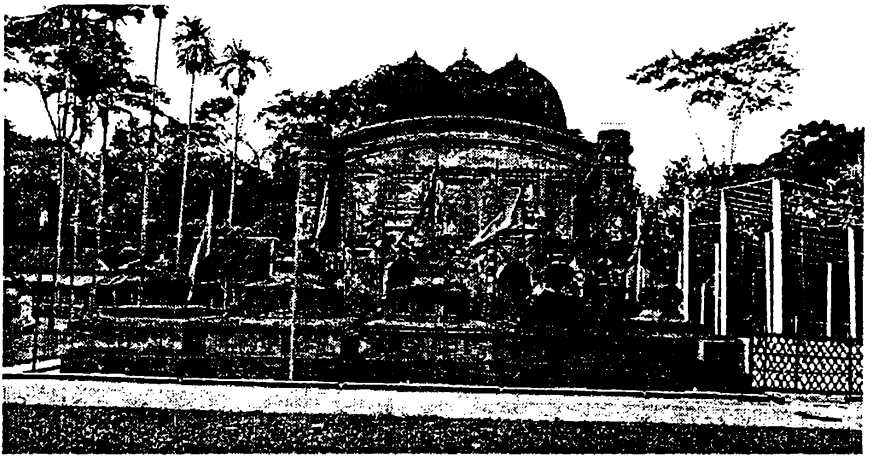

মেহের কালীবাড়ি ও হযরত শাহ রাস্তি

আনুমানিক বাংলা সন হিসেবে ৬০৯ অব্দ। গঙ্গা তীরে জটাধারী এক সাধু তপস্যারত। গঙ্গা তীরে সিদ্ধি লাভের আশায় কত সাধুই তো তপস্যায় বসে। তবে কতক নিছকই বেশধারী, কতক সংসার ধর্ম ত্যাগ করা। কিন্তু, এই সাধুকে দেখলে আপনাআপনি প্রশান্তি জাগে। মৌনব্রত সাধুটির নাম বাসুদেব। ভারতের বর্ধমানস্থ পূর্বস্থলী গ্রামের অধিবাসী বাসুদেব। সেই কবে ঘর ছেড়েছিলেন মা তারার সাক্ষাৎ পেতে। তবুও পরিবার-পরিজন মাঝেমাঝে এসে দেখে যান বাসুদেবকে। ফলমূল, খাবার দিয়ে যান, কিন্তু মৌনব্রত বাসুদেব ইশারায় সব নিয়ে যেতে বলেন।

অমাবস্যার নিকষ কালো রাত। ধুনির প্রজ্জ্বলিত আলোতে নদীতীরে তপস্যারত সাধুর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। নির্জন নদীর মৃদুমন্দা ঢেউয়ের ছলাৎছলাৎ ধ্বনি আর শোনা যায় ধুনির কাঠ পোড়ার শব্দ। বহুদূরের শ্মশান থেকে হরি নাম ভেসে আসে বাসুদেবের কানে, নিশ্চয়ই কোনো মরা এসেছে। হঠাৎ সবকিছু যেন আরো নিস্তব্ধ হয়ে যায়, বাসুদেব বুঝতে পারে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কিছুক্ষণ পরেই মধুমাখা অলৌকিক কণ্ঠে শুনতে পেলেন আদেশ, "বাসুদেব, এই স্থানে তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবে না। তুমি মেহেরপুর গ্রামে মা তারা আশ্রমে গিয়ে তপস্যা করো। সেখানেই তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবে।"

চটকা ভেঙে উঠে পড়ে বাসুদেব। মৌনতা ভেঙ্গে বাসুদেব বলে উঠে, "মা মা, জগদ্ধাত্রী মা তারার জয় হউক।" দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামতে থাকে বাসুদেবের। তিনি তখনই রওনা দিলেন মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে। কেউ জানলো না, দেবীর আদেশে বাসুদেব কোথায় চলছেন।

BanglaBook.org

কয়েকমাস পর, বহু পথ ঘুরে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে বাসুদেব মেহেরপুর গ্রামে পৌঁছলেন। সে সময়ে শিবানন্দ নামে প্রভাবশালী এক জমিদার বসবাস করতেন মেহেরপুরে। তিনি জটাধারী সাধুর আগমন বার্তা শুনে ছুটলেন সাধু দর্শনে। মা তারার ভক্ত বাসুদেবকে তিনি আশ্রয় দিলেন। মা তারা আশ্রমের পাশেই বাসুদেবের জন্যে বাড়ি তৈরি করে দিলেন। ওদিকে বাসুদেবের আপনজনেরা তাকে খুঁজে হয়রান। তারপর একদিন তারা মেহেরপুর গ্রামে এসে তার দেখা পেলো। কিন্তু বাসুদেব তাদের ফিরিয়ে দিলেন।

বাসুদেব গঙ্গাতীরে তপস্যার সময়ে শ্মাশানচারীদের ভেট হিসেবে মদের বোতল পেতেন নিয়মিত। সেই তখন মদের নেশা পেয়ে বসেছিল তার। জমিদার শিবানন্দের দৌলতে কোনো কিছুর অভাব ছিলো না বাসুদেবের। মেহেরপুরে এসে, তার মদ্যপানের পরিমাণ আরো বেড়ে গেলো। প্রায় তিনি মদ্যপান করে মাতাল হতেন। একদিন জমিদার শিবানন্দ এই খবর পেয়ে তাকে দেখতে গেলেন। মাতাল বাসুদেব কিছু না ভেবেই শিবানন্দকে বললেন, "শীঘ্রই তোর শিরচ্ছেদ হবে।"

গুরুদেব বাসুদেবের মুখে এই কথা শিবানন্দের দুশ্চিন্তা হলো। কে তার শিরচ্ছেদ করবে! রীতিমতো রাজার মতো তার ফৌজ, প্রজারা তাকে ভালোবাসে।

তিনি বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরে এলেন। এমন সময় খবর এলো, দিঘি খননের সময় দু'দল শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধেছে। শুনে শিবানন্দ শীঘ্রই ছুটলেন দিঘির পাড়ে। কিন্তু নিয়তি খন্ডায় কে! দু'পক্ষের সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে, হাসুঁয়ার কোপ পড়লো শিবানন্দের ঘাড়ে। শিরচ্ছেদ হলো প্রতাবশালী তরুণ জমিদারের।

জমিদারের করুণ এই পরিণামে কষ্ট পেলেন নিঃসন্তান জমিদার পত্নী হেমাবতী। হেমাবতী বাসুদেবের কাছে ছুটলেন। তার চরণে পড়ে বংশ রক্ষা করার জন্যে অনুরোধ জানালেন বাসুদেবের কাছে। বাসুদেব হেমাবতীকে সান্ত্বনা দিলেন। বাসুদেবের আশীর্বাদে অল্পদিনে রাণীর এক পুত্র সন্তান জন্ম নিলো। দেব শিশুর ন্যায় অপরূপ শিশুটি মাথায় জটা নিয়ে জন্ম নিলো। বাসুদেব তার নাম রাখলেন জটাধারী।

জমিদার পত্নী হেমাবতী শিশু জটাধারীকে নিয়ে দক্ষতার সাথে জমিদারি সামলাতে লাগলেন। এবার বাসুদেব প্রধান শিষ্য পূর্ণানন্দকে সাথে নিয়ে তীর্থে বের হলেন। হিন্দুদের অনেক পুণ্যস্থান ভ্রমণ করলেন। কেটে গেলো অনেকগুলো বছর, অবশেষে একদিন এলেন কামাখ্যায়। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আগের মতো চলতে পারেন না। পূর্ণানন্দকে আদেশ ছিলেন আসন করার। আসন করলে তিনি

BanglaBook.org

বসলেন ধ্যানে, আজও অমাবস্যার রাত, অদূরে অন্যান্য সাধুদের ধুনির আলো জ্বলছে। বাসুদেবের তন্দ্রা এসে যায়, তন্দ্রাবস্থায় তিনি শুনতে পেলেন সেই গঙ্গাতীরের দৈববাণী। স্বর্গীয় দেবী তাকে আদেশ করে বলছেন, "বৎস! তুমি পরজন্মে স্বীয় পৌত্ররূপে জন্ম নেবে, তখনই তুমি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করবে।" এমন অবস্থাতেই বাসুদেবের প্রাণ বায়ু নিগর্ত হলো।

বাসুদেবের মৃত্যুর পর কেটে গেছে বেশকিছু বছর। একদিন মেহেরপুর গ্রামে বাসুদেবের পুত্রবধূর ঘরে জন্ম নিল এক সন্তান। নাম হলো সর্বানন্দ। ছোটো থাকতেই সর্বানন্দ অত্যন্ত নির্বোধ ও নিষ্ঠুর। বাবা-মা অনেক চেষ্টা করেও তাকে টোলে পাঠাতে পারলো না। সুতরাং সর্বানন্দ অবোধ ও অশিক্ষিত রয়ে গেলো। ধীরে ধীরে ছোট্ট সর্বানন্দ বড়ো হতে লাগলো, সেই সাথে সর্বমহলে হতে লাগলো অবহেলিত। কিন্তু, গুরু বংশের লোক বলে, কেউ তাকে কিছু বলার সাহস পেতো না।

প্রথাক্রমে সর্বানন্দ জমিদার বাড়ির কুল গুরু হলো। একদিন জমিদার সর্বানন্দকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কোন তিথি?" সর্বানন্দ বললেন, "পূর্ণিমা।"

কিন্তু সেদিন ছিলো অমাবস্যা। কথা শুনে সবাই হাসাহাসি শুরু করলো এবং নানা রকম বিদ্রুপ করলো। জমিদার ক্ষুব্ধ হয়ে চিরদিনের জন্য তার প্রাসাদ সর্বানন্দের জন্যে নিষিদ্ধ করলেন। শিষ্যদের এই হেন উপহাসে সর্বানন্দ মনে নিদারুণ কষ্ট পেলেন। মনের কষ্টে গৃহত্যাগ করলেন। অনেক তীর্থ পরিভ্রমণের পর পৌষ সংক্রান্তির রাতে কালীমাতা তাকে দেখা দিলেন। দেবীর দয়ায় সর্বানন্দের সিদ্ধিলাভ হলো। সেদিন ছিলো পৌষ সংক্রান্তি।

সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত এইখানে পৌষ সংক্রান্তিতে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজা উপলক্ষে মেলা বসে প্রতি বছর। কালীমাতা স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছেন বলে এখানে কোনো কালীমূর্তি স্থাপন করা হয় না। প্রতি বছর কার্তিক মাসে কালীপূজা হয়, পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। দেশ-বিদেশ থেকে আসে অসংখ্য পুণ্যার্থী, মায়ের পায়ে প্রণতি জানান, মনের বাসনা পূরণের জন্যে প্রার্থনা করেন। কালীগাছের চতুর্দিকে ঘুরে ঘরে ভক্তরা সংগীত পরিবেশন করেন। ঢাকের বাদ্যে মুখরিত হয় চারদিক। ভক্তরা সারারাত ধরে নাচে-গানে আনন্দে মাতোয়ারা হন। এ সময় মানত করে ভক্তরা পাঠা বলি দেন। এত সব ঘটনাবহুল ইতিহাস নিয়ে মেহের কালীবাড়ি আজো দাঁড়িয়ে আছে তার আপন ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল হয়ে।

হযরত শাহজালালের সাথে যে ১২ জন আউলিয়া এদেশে আসেন, তাদের অন্যতম শাহ রাস্তি। তিনি মেহেরপুরের শ্রীপুরে কালীর প্রভাব ও অন্ধবিশ্বাসের

BanglaBook.org

কথা শুনে এই অঞ্চলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। মেহেরপুরে পৌঁছে আস্তানা বানালেন কালীমন্দিরের কিছু দূরে। পীর শাহ্ রাস্তির অলৌকিক কর্মকাণ্ডে এক সময় বহু সংখ্যক লোক রাস্তি শাহের মুরিদ হতে এলে এলাকায় তীব্র পানি সঙ্কট দেখা দিলো।

এই পানি সমস্যার সমাধান করতে রাস্তি সাহেব একটি দিঘি খননের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এক রাতেই জ্বীনদের সাহায্যে আঠাশ একর জায়গাতে দিঘিটি খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। একসময় মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবী কালী এসে শাহ্ রাস্তিকে বললেন, "তুমি এক অসম্ভব কাজের ভার নিয়েছে ফকির, কিছুতেই ভোরের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারবে না।"

শাহ্ রাস্তি এ কথায় ক্ষুদ্ধ হলেন এবং বললেন, "মহান আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় দুনিয়া ধ্বংস হতে পারে, এ আর এমন কি!"

শাহ্ রাস্তি (রঃ) আধ্যাত্মিক সাধনা বলে জ্বীন আনয়ন করলেন। জ্বীনেরা দ্রুততার সাথে দিঘি খনন করতে থাকে। দিঘি খননের অগ্রগতি দেখে কালী বিস্মিত হলেন এবং সন্দিহান হলেন শাহ্ রাস্তি শেষ পর্যন্ত সফলতার পেতে যাচ্ছেন। মরিয়া হয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি মোরগের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। তখন দিঘির শুধুমাত্র উত্তর পাড়টুকু বাঁধানো বাকি ছিলো। মোরগের ছদ্মবেশে তিনি ডেকে উঠলেন এবং ভোর হবার ইঙ্গিত করলেন। ভোর হয়েছে মনে করে জ্বীনগুলো খননকার্য সমাপ্ত না করেই একে একে ফিরে গেলো। সেই থেকে অদ্যাবধিও উত্তর পাড় আর বাঁধানো হয়নি।

চাঁদপুর জেলার শাহ্ রাস্তি উপজেলাধীন শ্রীপুর গ্রামে হযরত রাস্তি শাহ্ (রঃ)-এর মাজার শরীফ অবস্থিত। এই মহান ইসলাম প্রচারক রাস্তি শাহ্ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাঁর জন্ম ইরাকের বাগদাদ শহরে। তিনি ছিলেন হযরত বড়ো পীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর বংশধর। তাঁর পিতা ছিলেন বড়ো পীর সাহেবের ভাগ্নে। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথম ইয়েমেন আসেন ৭৩৮ বঙ্গাব্দে। ইয়েমেন থেকে স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত হয়ে ইসলাম প্রচারে এদেশে আসেন। ইয়েমেন হতে এদেশে আসেন বলে অনেকে তাঁকে ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত বলেও থাকেন। মাজারে রক্ষিত একটি বোর্ড থেকে জানা গেছে, তাঁর জন্ম ১২৩৮ খ্রিঃ সালে এবং এদেশে আগমন করন ১৩৫১ সালে। বহু অলৌকিক ঘটনা এলাকাবাসীকে প্রত্যক্ষ করিয়ে ১৩৮৮ সালে ইন্তেকাল করেন।

BanglaBook.org

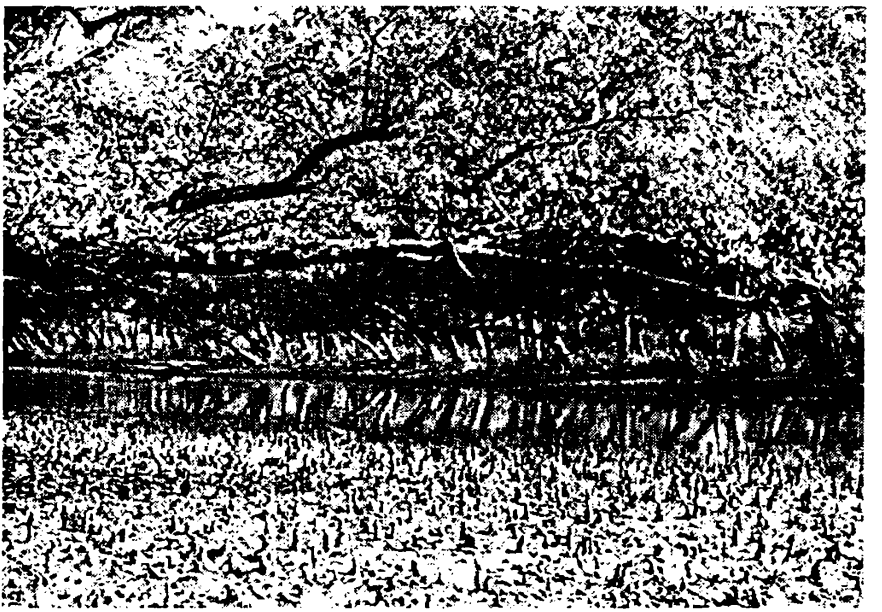

কমল বাওয়ালির উপাখ্যান

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন, বাংলাদেশের সুন্দরবন। লোনাপানির এই বনের বুক চিড়ে বয়ে গেছে সরীসৃপের মতো অসংখ্য ছোটো বড়ো খাল, নদী-নালা। জোয়ারের সময় পূর্ণ হয়ে ওঠে সবগুলো। এরই দৌলতে গড়ে উঠেছে ঘন নিবিড় বনাঞ্চল। চারিদিকে ঘন বন, আকাশ ছোয়া কড়াই, সেগুন, জাম, গর্জনের সমারোহ। নিচে গোলপাতা। কাছেই ভৈরব নদী। যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্যে অপরিসীম ভূমিকা রাখে নদীটি। আর তাই এর পাশেই গড়ে উঠেছে ইংরেজদের নীলকুঠি।

অত্যাচারি ইংরেজরা জোর করে নীল চাষ করায় এলাকার বাসিন্দাদের দিয়ে, নইলে শাস্তি। তেমনই, এ অঞ্চলে নীলকুঠি বানিয়েছেন রেনি সাহেব। ইংল্যান্ডে ছিলেন ভ্যাগাবন্ড কিন্তু সুযোগসন্ধানী মানসিকতায় ভাগ্যের চাকা বদলাতে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। ব্লাডি নেটিভদের রেনি সাহেব দু'চোক্ষে দেখতে পান না, কাম চোর আদমি সব। কিছুদিন আগে নীলকর রেনি সাহেবের লোকজন ঢেরা পিটিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন সবাইকে নীলচাষ করতে হবে, যারা করবে না তাদের জন্য কঠিন শাস্তি! চাবুক দিয়ে চাবকে পিঠের ছাল তুলবেন, সাহেব স্বয়ং।

BanglaBook.org

কিছুদিন আগেও সকলে মিলে হই হুল্লোড় করে মধু আর গোলপাতা সংগ্রহ করতে ঘন বনে আসতো। কিন্তু এখন সবাইকে বাপ-দাদার পেশা ছেড়ে রেনি সাহেবের কুঠিতে যেতে হয় নীল উৎপাদনে। কিন্তু করিম বাওয়ালির সেসব কাজে একদমই মন বসে না। করিম বাওয়ালী এই এলাকার একজন পেশাদার মধু ও গোলপাতা সংগ্রহকারী। বন থেকে এসব সংগ্রহ করে তুলে দেয় মহাজনের হাতে, বিনিময়ে যে টাকা পায় তা দিয়ে ভালোভাবেই কাটছিল বাবা-মেয়ের জীবন। কিন্তু লালমুখো রেনি সাহেব আসায় তাদের এই সুখ বেশিদিন রইলো না।

করিম বাওয়ালি বাপ দাদার পেশা মধু ও গোলপাতা সংগ্রহ করা, এই পেশা সে কিছুতেই ছাড়বে না। তার ওপর নীল চাষে কোনো লাভও নেই। এই কারণে সে মেয়েকে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করে বনে, গভীর রাতে ঘরে ফেরে নীলকর রেনি সাহেবের ভয়ে। নীলকর রেনি সাহেবের অত্যাচারে মানুষের জীবন একদম ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ রায়কে স্মরণ করে কিশোরী কন্যা কমল নিয়ে বের হয় মধু ও গোলপাতা সংগ্রহ করতে। সেই ঘন বনের মধ্যে কিশোরী কমল আর তার বাবা করিম বাওয়ালী মধু আর গোলপাতা সংগ্রহ করছে ঘুরে ঘুরে।

কমল কীভাবে জানি সবসময় মৌমাছির বড়ো চাকগুলো খুঁজে পায়। আজও কমলের চোখে বড়ো একটা চাক পড়লো। একটা বড়ো গাছ থেকে মৌ এর চাক ভাঙছিল তারা। বাবা ওপরে আর মেয়ে কমল নিচে দাঁড়ানো। এমন সময়ে ঘোড়ার পদশব্দে চমকে উঠলো তারা, বুঝতে কষ্ট হলো না অত্যাচারী রেনি আসছে। ভয়ে চতুর্দশ বর্ষীয়া কমল এতটুকু হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি করিম বাওয়ালি গাছের ওপর থেকে মেয়েকে গোলপাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ার ইশারা করলো, আর নিজে গাছের আরও ওপরে ঘন পাতার আড়ালে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যের রেনি সাহেবের ঘোড়া এসে থামলো গাছের গোড়ায়, কমল পালিয়ে যাবার সময়ে ভুলে মধু সংগ্রহের সরঞ্জাম নিতে ভুলে গিয়েছিল, সেটা চোখে পড়ে গেলো তার। সতর্ক দৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকাতেই চোখ পড়লো ভয়ার্ত করিম বাওয়ালির দিকে। ঘোড়ার ওপরের বসেই শাই শাই করে শূন্যে চাবুকের আঘাত করে চেঁচিলো উঠল "কে লুকিয়েছিস, ভালো চাস তো বের হয়ে আয়, নইলে ঘরবাড়ি জায়গা জমি সব হারাবি।" ধীরে ধীরে ভয়ার্ত করিম বাওয়ালি নিচে নেমে আসে।

রেনি সাহেব শুধায়, "নাম কী তোর?"

"করিম বাওয়ালি।" ভয়ার্তকণ্ঠে বলে উঠে করিম।

"কুঠির খাতায় নাম লিখিয়েছিস?" সক্রোধ দৃষ্টিতে রেনি সাহেব শুধায়।

"না হুজুর!"

BanglaBook.org

আর কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন মনে করলো না রেনি সাহেব, শপাং শপাং শঙ্কর মাছের চাবুকের আঘাতে কঁকিয়ে উঠলেন করিম বাওয়ালি, মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। বাবার এই অবস্থা দেখে গোলপাতার আড়ালে আর লুকিয়ে থাকতে পারলো না কিশোরী কমল। সুন্দরবনের বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য যে বর্শাটা সে সাথে রাখতো সবসময়ে, সেটাই সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে লাফিয়ে এসে পড়লো রেনি সাহেবের সামনে। এই অতর্কিত হামলার জন্য রেনি সাহেব মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, কোনোকিছু বুঝে ওঠার আগেই কমল বর্শাটা ছুড়ে দিল রেনির বুকের দিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে সেটা বুকে না লেগে বাহুতে লাগলো, যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো সে। বাহু থেকে অঝোর ধারায় রক্ত পড়া শুরু হলো, পরমুহূর্তেই জ্ঞান হারালো নীলকর রেনি।

অত কিছু খেয়াল করার সময় নেই কমলের; সে আর তার বাবা, দুজনে মিলে রেনির চাবুকটা দিয়েই পেঁচিয়ে তাকে বেঁধে রেখে তার ঘোড়া নিয়ে গহীন অরণ্যের দিকে হারিয়ে গেলো। পেছনে পড়ে রইলো অত্যাচারী রেনি সাহেব আর জনপদ।

অতীতের দিনগুলো পেছনে ফেলে করিম বাওয়ালি আর কমল গেলো কোথায়?

১৮৩১ সালে তিতুমীরের বিদ্রোহী দলে খুলনার শত শত লাঠিয়াল কিষান যোগ দিয়েছিলেন, তিতুমীরের মৃত্যুর পরে এরা সুন্দরবনে আত্মগোপন করে। সুযোগ বুঝে নীলকরদের আস্তানার হানা দিয়ে ধনসম্পদ, অস্ত্র লুণ্ঠন করতো।

তেমনই একটা দলে যোগ দিলো করিম আর কার কন্যা কমল। এই দস্যুদের বেশিরভাগই ছিল নীলকর সাহেবেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী। দস্যুরাও কমল ও করিমকে মহাসম্মানে তাদের দলে স্থান দিল।

এরপরে তিতুমীরের একজন অনুচরের সাথে কমলের একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগলো। নাম তার সৈয়দজান। কৈশোরে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে, আর তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায় যোগ দিতে হাজির হয়েছিল সৈয়দজান। তারপর তিতুমীরের নিজের হাতে তৈরি হতে থাকে সে। যখন ইংরেজ সৈন্যরা কেল্লা আক্রমণ করে, তখন ও লড়েছিল বীরের মতো। কিন্তু পরাজয় নিশ্চিত জেনে, গুরু কয়েকজনকে ডেকে বলেছিলেন পালাতে। হুকুম ছিলো ভবিষ্যতে ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত রাখার। সৈয়দজানেরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আসছে সেই থেকে। একে তো গহীন বন, তার ওপর অসংখ্য নদী-নালার বিস্তারে ইংরেজ সৈন্যরা প্রায়ই নাকাল হয় এদের হাতে।

এই সৈয়দজানের সাথেই হৃদ্যতা গড়ে উঠলো কমলের। সৈয়দজান এখন

BanglaBook.org

পরিপূর্ণ এক তরুণ। নিয়মিত শরীরচর্চা ও বর্শা চালোনায় সুঠাম বাহু ও দেহপল্লবী যে-কোনো নারীকে আকর্ষণ করতে বাধ্য। কমলও প্রথম দেখায় আকৃষ্ট হলো, কিন্তু জানলো না সৈয়দজানও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

প্রথম দিন থেকেই কমল আলাদা সম্মান পেতো দস্যুদল থেকে। কারণ, ততদিনে রেনি সাহেবের ঘটনা এদের কানে পৌঁছেছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম কোনো নারী অস্ত্র তুলে নিয়েছে। সৈয়দজান নিজ হাতে অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগলো কমলকে। বর্শা চালোনায় কমল আগেই দক্ষ ছিলো, সৈয়দজানের নিষ্ঠায় তা হয়ে উঠলো আরো নিখুঁত, শিখলো সুনিপুণভাবে তলোয়ার চালানো। এরপর একে একে বিভিন্ন অভিযানে কমল অংশ নিতে থাকে। সেই সময় থেকে কমল ছেলেদের মতো পোশাক পরা শুরু করলো। এতে করে সৈয়দজান ও কমল আরো কাছাকাছি হলো। কিন্তু মনের কথা কীভাবে বলা যায়...বিদ্রোহীদের যে ঘর সংসার নেই।

অর্থনৈতিক ও যাতায়াতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুন্দরবনের কাছেই একটা সরকারি থানা। সেখানে প্রচুর অস্ত্র আর সৈন্য মজুত রাখা হতো যাতে বিদ্রোহীদের সহজেই দমন করা যায়। একদিন সৈয়দজানের দল ঠিক করলো, সে থানাটি লুট করবে। কারণ, দলে দিনে দিনে লোক বাড়ছে এবং ইংরেজ সৈন্যরা ঘনঘন ঝামেলাও করছে।

দস্যুরা বড়োসড়ো এই আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। তারপর এক শুভদিন দেখে গভীর রাতে রওনা দিলো বিদ্রোহী দল। ছিপনৌকাগুলো সন্তর্পনে এগুতে শুরু করেছে। ছোট্ট একটা ডিঙ্গিতে শুধু সৈয়দজান ও কমল। সৈয়দজান বৈঠা ঠেলছে, মনটা বড়ো অস্থির হয়ে আছে তার। নিরবতা ভেঙ্গে কমল বলল, "জনাব, আপনি কি আজকের অভিযান নিয়ে চিন্তা করছেন? দেখবেন জয় আমাদের হবে।"

চটকা ভেঙে সৈয়দজান বলে, "না কমল, সে চিন্তা করি না। এ দলে যখন আপনার মতো বীরাঙ্গনা মজুত আছে, জয় তো আমাদের হবেই।"

সৈয়দজানের প্রশংসায় লজ্জা পায় কিশোরী কমল। সৈয়দজান নীরবতা ভেঙে আবার ডাকে, "কমল।"

"জি, বলুন জনাব..." কমল উত্তর দেয়।

"জানি না, আজ আমাদের কপালে কী ঘটবে। কে বাঁচবে, কে প্রাণ দিবে কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।" সৈয়দজান এক নিঃশ্বাস বলে উঠে।

উৎকণ্ঠিতভাবে কমল শুধায় সে কথা।

সৈয়দজান উত্তর দেয়, "প্রথম দিন আপনাকে দেখেছিলাম, আপনার দু'চোখের প্রেমে পড়েছিলাম। এরপর ধীরে ধীরে আমার সবকিছু আপনাকে

BanglaBook.org

মনেপ্রাণে সঁপে দিয়েছি। জানি, আমরা যে পথে আছি, সেপথ কন্টকময় কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখি।"

বিস্ময়ে হতবাক কমল চুপ থাকে।

সৈয়দজান আবার বলে, "গোস্তাকি হলে মাফ করবেন, আমি...আমি ভাবতাম আপনিও আমাকে পছন্দ করেন।"

এবার ব্যাকুলকণ্ঠে কমল বলে উঠে, "আমিও যে সবকিছু আপনাতে সঁপে দিয়েছি জনাব। এখানে নতুন জন্ম হয়েছে আমার, এখানে এভাবেই যেন আপনার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি।"

ইতোমধ্যে, গন্তব্য চলে আসে। সবাই তৈরি হয় আক্রমণের। কমল আর সৈয়দজানের দল বীরবিক্রমে এসে হানা দিল থানায়। মুহূর্তেই শুরু হলো থানার সরকারি সৈন্য আর বিদ্রোহীদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ। এমনই সে ভয়ানক যুদ্ধ মানুষের আর্ত চিৎকারে ঐ অঞ্চলের বন্য জীবজন্তু পর্যন্ত বন ছেড়ে লোকালয়ে যেতে লাগলো! বিদ্রোহীদের জয়ের শেষ মুহূর্তে একটি বর্শা এসে লাগলো কমলের বুকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। সৈয়দজান দৌড়ে এলো কমলের কাছে। কাঁদতে কাঁদতে তুলে নিলো কমলের ভূ-লুণ্ঠিত দেহ। এই কি সে চেয়েছিল! ভালোবাসা কত কাছে এসে ফিরে গেলো আপন নীড়ে। সৈয়দজানের মনে পড়ে কমলের শেষ কথা, "আমিও যে সবকিছু আপনাতে সঁপে দিয়েছি জনাব। এখানে নতুন জন্ম হয়েছে আমার, এখানে এভাবেই যেন আপনার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি।"

এবার হুহু করে চিৎকার করে ওঠে সৈয়দজান। মনের মানুষের মৃত্যুতে নাকি অসম এক বঙ্গবীর কন্যার জন্য, কে জানে।

এরপর ধীরে ধীরে আবাদি জমি বাড়তে বাড়তে বন যখন বঙ্গোপসাগরের দিকে সঙ্কুচিত হচ্ছিল তখন স্বদেশী দস্যুরাও বনের গভীরে না গিয়ে ধীরে ধীরে জনপদে মিশে যেতে লাগলো।

ইতিহাসে রেনির অত্যাচারের কথা উল্লেখ থাকলেও কমল আর তার পিতার কোনো উল্লেখ নেই। খুলনার লোকমুখেই শুধু সাহসী কমলের নাম শোনা যায়। বর্তমান খুলনার দেড় মাইল উত্তর পূর্বে ভৈরব নদীর দক্ষিণে রেনিগঞ্জ নামে একটা জায়গা আছে, যা এই নীলকুঠীর অত্যাচারী রেনি সাহেবের নামেই হয়েছিল।

খুব বেশিদিন আগের কথা কিন্তু নয়, বাংলার বিপদ-সংকুল এক বন্য অজ পাড়াগায়ে মাত্র চতুর্দশ বর্ষীয়া যে বাওয়ালি মেয়েটি সর্বপ্রথম নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তার কথা ইতিহাসে লেখা না থাকলেও খুলনার মানুষের মুখে আর অন্তরে আজও সে স্মরণীয় হয়ে আছে।

BanglaBook.org

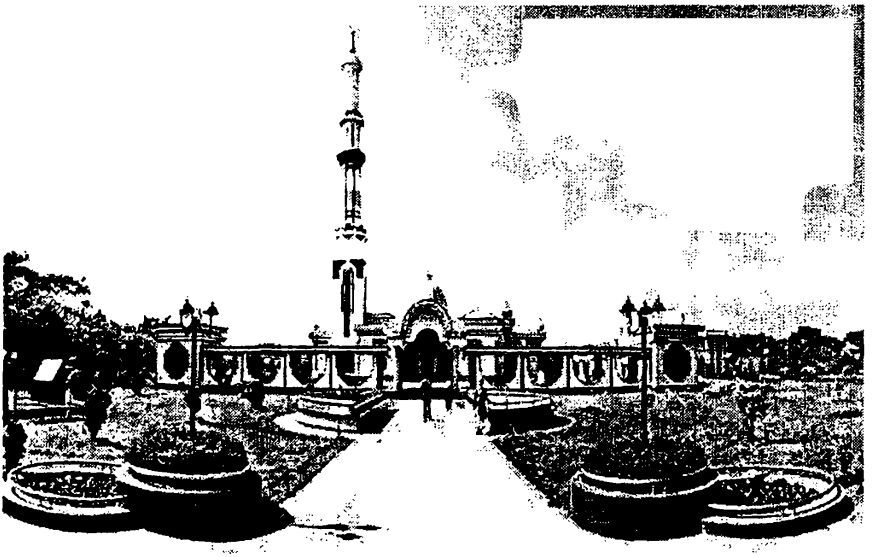

গানস্ অব বরিশাল

মাত্র দু'দিন হলো বাকেরগঞ্জে পৌঁছেছেন সিভিল সার্জন হেনরি বেভারিজ। চারদিকে বিস্তৃত জলরাশি। চোখ যেদিকে চায় শুধু পানি আর পানি। চারদিক নদী বেষ্টিত দ্বীপটির পূর্বনাম ছিলো চন্দ্রদ্বীপ। মোটামুটি নির্জন এ পথে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা যাতায়াত করে, সেই সাথে করে লুণ্ঠন। তাদের ঠেকাতেই এখানে গড়ে উঠেছে দূর্গ, অবস্থান করছে গোরা পল্টন। প্রায় চলে যাওয়া চাকরিটা বাঁচাতে এই মরার জায়গায় হাজির হয়েছে বেভারিজ। কিন্তু ম্যাজিস্টেট থমসনের সাথে আজকের সন্ধ্যাটা বেশ ভালোই কেটেছে। থমসনও ওর মতোই পরিস্থিতির শিকার। রগচটা বলে পল্টনে ওর দুর্নাম ছিলো, আর তাই তার বদলি হয়েছে এখানে। থমসনের বছর খানেক হয়ে এলো এখানে। আনন্দের উপকরণ ঠিকই যোগাড় করে ফেলেছে ও। স্বদেশী ইংরেজ বেভারিজকে পেয়ে আজ ভোজের আয়োজন করেছিলো থমসন। ভরপেট খেয়ে দেয়ে, খানিকক্ষণ দাবা খেলে তবে কটেজে ফিরেছে।

এবার হালকা স্কচ খেয়ে শান্তির ঘুম, সেই ভোরে বের হতে হবে, পল্টনের রুটিন চেক-আপে থাকতে হবে। বেশ ঝক্কিময় দিন যাবে একটা।

শুয়ে পড়ার খানিকক্ষণ পরেই চমকে জেগে ওঠে বেভারিজ। দ্রিম দ্রিম প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে কেল্লা। চকিতে হাতের রেডিয়াম ঘড়িটার দিকে চোখ যায় ওর। সবে রাত মাত্র নয়টা।

এ কীসের আওয়াজ?

BanglaBook.org

কামানের?

তবে কি পর্তুগীজ কোনো নৌবহর আক্রমণ করেছে কেল্লা!

আর কিছু ভাবতে পারলেন না বেভারিজ। এক ঝটকায় বিছানা থেকে নেমে ছুটলেন আস্তাবলে। এখনই পৌঁছুতে হবে থমসনের কাছে। আরো একবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলো চারদিক।

ব্যারাকে পৌঁছে দেখলেন থমসন চিন্তিত মুখে দৌড়াদৌড়ি করছে। চারদিক থমথমে। সৈন্যরা সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি। যে-কোনো আক্রমণ রুখে দিতে তারা প্রস্তুত। বেভারিজকে দেখে দৌড়ে এলো, বলল, "তুমি শুনেছ, শব্দটা? কী মনে হয়, কোনো পর্তুগীজ দস্যু দল?" বেভারিজ নিজেও ধরে নিয়েছিল, হয়তো বা কোনো পর্তুগীজ দস্যু দল। নিশ্চয়ই বিশাল আকৃতির শক্তিশালী কোনো কামান থেকে গোলা বর্ষণের আওয়াজ ছিল এটা।

তাই যদি হয়েই থাকে তবে এতবড়ো কামান পর্তুগীজরা পেলো কোথায়! নিশ্চয় বড়ো কোনো দল হবে। সারারাত সর্তক পাহারায় কাটালো পল্টন। উৎকণ্ঠিত থমসন ও বেভারিজ একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে চললো। শব্দ কিন্তু আর হলো না।

রাতের আঁধার কেটে একসময় সূর্য উঁকি দিলো। কয়েকজন সেপাই সন্তর্পণে ছুটলো খাড়ির দিকে। যদি কোনো নৌবহর দেখা যায় এই আশায়। কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত কিছুই দেখা গেলো না। ফিরে এলো সিপাহীরা। রাত্রি জাগার ক্লান্তি আর আসন্ন লড়াইয়ের ভাবনা মাথায় নিয়ে ঘরে ফেরার জন্য বের হলো বেভারিজ। আজ আর রুটিন চেক-আপ হবে না। সবাইকে সর্তক অবস্থায় থাকতে বলা হয়েছে।

ঘোড়া নিয়ে বাজারের কাছাকাছি আসতেই দেখতো পেলো স্থানীয়দের জটলা। সবাই কালকের শব্দটা নিয়ে কথা বলছে। আসন্ন লড়াই নিয়ে সবাই ভীতসন্ত্রস্ত। লড়াই শুরু হলে, এদেরই ক্ষতি হবে বেশি।

বিকেলে আবার ক্যাম্পে ফিরে এসেছে বেভারিজ। সারাদিন একটানা ঘুমিয়ে বেশ চাঙা বোধ করছে ও। ওদিকে থমসনের কপালে ঘুম জোটেনি মোটেও। দ্রুতগামী নৌকা, লঞ্চ নিয়ে মোহনার দিকে ঘন জঙ্গলটায় বেশ কয়েকবার খোঁজা হয়েছে। কিন্তু কিছুই মিলেনি। সব যেন জাদুমন্ত্রে উড়ে গিয়েছে। সারা সন্ধ্যা উত্তেজনায় কাটলো সবার। আশেপাশের গ্রামের অনেকেই পালিয়েছে। যারা আছে, তারা নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে। রাস্তাঘাটে জনমানুষের অস্তিত্ব নেই। আগের দিনের মতোই ঠিক নয়টায় হলো শব্দটা। পরপর কয়েকবার সেই বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠলো বাড়িঘর, স্থাপনা আর পায়ের নিচের মাটি। শিউরে উঠলো সবাই, এত ভয়ংকর আওয়াজও হতে পারে! আবার সব সুনসান।

BanglaBook.org

সে রাতেও কিছু ঘটলো না।

এভাবে কেটে গেলো আরো কয়েকটা দিন। প্রতি রাত ঠিক নয়টায় হতে লাগলো বিকট আওয়াজ, কেঁপে উঠতে লাগলো সবকিছু। ব্যস, এতটুকুই। যথাসময়ে ইংরেজ পরিদর্শক দল এলো কিন্তু বারবার খুঁজেও কিছু পেলো না। তারপর একসময় ব্যাপারটাতে মানিয়ে গেলো সবাই। আবার স্বাভাবিক হলো জীবনযাত্রা।

বরিশাল গানস্ বা গানস্ অব বরিশাল বলতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বরিশাল এলাকায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ঘটা বিকট কিছু শব্দকে বোঝায়। এ ধরনের অব্যাখ্যেয় শব্দগুলোকে একত্রে বলা হয় মিস্টপুফার্স। বরিশালের মত ভারতের গঙ্গা নদীর তীর, যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, স্কটল্যান্ড, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, জাপান, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া উত্তর সাগরসহ আরও কিছু এলাকায় এ ধরনের শব্দ শোনা গেছে।

ব্রিটিশদের আগমনের প্রায় এক শ বছর পর প্রথম বরিশালে এ শব্দ শোনা যায়। সে সময় বরিশালের পূর্বনাম ছিল নাম ছিল বাকেরগঞ্জ, বাকেরগঞ্জের তৎকালীন ব্রিটিশ সিভিল সার্জন প্রথম ঘটনাটা লেখেন। বর্ষা আসার আগে আগে গভীর সাগরের দিক থেকে রহস্যময় কামান দাগার শব্দটি ভেসে আসতো।

১৮৭০-এর দিকে প্রথমবারের মতো বরিশাল গানস্'র কথা নথিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যায়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই এটি শোনা যেত বলে নথিপত্রগুলোতে উল্লেখ করা হয়। ১৮৮৬ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির হিসাব অনুযায়ী খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, নারায়ণগঞ্জ, হরিশপুর প্রভৃতি স্থানে শব্দটি শোনা গেছে। টি. ডি. লাতুশ ১৮৯০ সালের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, বরিশাল গানস্ কেবল গাঙ্গেয় বদ্বীপ নয়, ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপেও শোনা গেছে। যে সব বিকট শব্দ শোনা যেত তার সাথে ঢেউয়ের শব্দের চেয়ে কামানের গোলা দাগার শব্দের সাথে বেশি মিল ছিল। কখনো কখনো একটা শব্দ শোনা যেত, আবার কখনও দুই বা তিনটি শব্দ একসাথে শোনা যেত। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল থেকে শব্দগুলো বেশি শোনা যেত।

কবি সুফিয়া কামাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তাঁর শৈশবে এধরনের রহস্যময় বিস্ফোরনের আওয়াজের কথা তিনি মুরুব্বীদের কাছে শুনেছেন। তার কথায়, ১৯৫০ এর পরে উনি কখনো এই শব্দ আর কেউ শুনেছে তা শোনেননি।

কিংবদন্তী এই গল্পটি আজো বরিশালের মানুষের মুখে মুখে ঘুরে ফেরে।

BanglaBook.org

সুন্দরবনের বাওয়ালী জাদুকর

দূর থেকে বোঝা যায় না ওটা একটা নৌকা। মনে হবে বিরাট একটা ঝোপের স্তূপ ভেসে আসছে। নৌকাটির যাত্রী মোটে তিনজন। একজন মাঝি, একটি স্থানীয় লোক আর এক সাহেব।

সাহেব এসেছেন কলকাতা থেকে। কলকাতা পুলিশের এক বড়ো-কর্তা তিনি, স্যার এডমন এলিসান। জাতে আইরিশ, নিজ কর্মগুণে পুলিশের বড়ো পদে অধিষ্ঠ হয়েছেন। এলিসান সাহেবের শিকারের বেশ শখ ছিলো। সাহেব অন্যান্য বনে বেশ কিছু বাঘ মারলেও সুন্দরবনে বিশেষ সুবিধা করতে পারছিলেন না। ইতোমধ্যে নানা জায়গা থেকে বাওয়ালীদের অলৌকিক কর্মাকাণ্ডের খবর তার কানে এসেছিল। বিশ্বাস না করলেও বাওয়ালীদের নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন বলে স্থির করলেন। ব্যবস্থামতো খুলনা জেলার মধ্যে দিয়ে সাহেব বাওয়ালীদের গ্রামে পৌঁছুলেন। কিন্তু কোনো বাওয়ালীই শিকারে যেতে রাজি হলো না। কারণ, এ বন তাদের রুটি-রুজি, তাই তারা কখনো বিনা কারণে বনের পশুপাখির ক্ষতি করে না। অবশেষে বুড়ো এক বাওয়ালী রাজি হলো। তবে শর্ত হলো, সে বাঘ দেখাবে কিন্তু গুলি করা চলবে না। অগত্যা রাজী হতে হলো সাহেবকে।

তারই জেরে আজকের এই নৌকা যাত্রা। নৌকা একসময় সুন্দরবনের গভীর এক অঞ্চলে পৌঁছুলো। এবার বাওয়ালী সাহেবকে এক জায়গায় বসতে বলে, হাতখানেক লম্বা এক অদ্ভূত ধরনের লাঠি দিয়ে সাহেবের চতুর্দিকে গণ্ডি কেটে ছিলো। সাহেবকে বারবার মনে করিয়ে দিলো শর্তের কথা। আর বললো সাহেব যেন গণ্ডির বাইরে না আসে। সাহেব মাটিতে বসে সেই ছেলেখেলা দেখে কৌতুক বোধ করছিলেন। একসময় হঠাৎ বুড়ো তার পিস্তল, বন্দুক গণ্ডির বেশ বাইরে রেখে, বলল, "সাহেব, চুপ করে বসে থাকুন, বাঘ আসবে।" এই বলে বাওয়ালী

BanglaBook.org

নিজেও সাহেবের পাশে গণ্ডির মধ্যে বসলো। এরপর কেটে গেলো অনেকটা সময়, নির্জন, নীরব নিস্তব্ধ বন, কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই, শুধু নির্জন চরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ফিসফিসানি ভেসে আসছিল ছলাৎ ছলাৎ...সাহেব তার ঘড়িতে দেখলেন বেলা বারোটা, নোনা মাটিতে রোদ ঠিকরে পড়ছিল। সাহেবের অস্বস্তি কিন্তু ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এদিকে পিস্তল-রাইফেলও হাতছাড়া। এমন সময় বাওয়ালীর দিকে চোখ পড়তেই সাহেব দেখলেন বাওয়ালী জঙ্গলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। সাহেব বাওয়ালীর দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকালেন কিন্তু কোথাও কিছু নেই। এদিকে বাওয়ালীর চেহারা ক্রমশ বদলে যেতে লাগলো। চোখের কোণে রক্তের ছিঁটে দেখা দিল। গলার শিরা ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। তারপর হাতখানেক লম্বা সেই অদ্ভূত লাঠিটা মাটিতে তিনবার ঠুকে বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে লাগলো।

সাহেবকে চমকে দিয়ে বুড়ো বাওয়ালী হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়লো। তারপর সেই অদ্ভূত লাঠিটি প্রসারিত করে ডেকে উঠলো, "আয়, আয়।"

ক্রমে সেই সুর চড়া পর্দায় উঠতে লাগলো, সেই সাথে বাওয়ালীর সর্বাঙ্গ তখন থরথর করে কী এক আবেগে কাঁপছিল। হতভম্ব সাহেবের কানে এমন সময় অনেক দূর থেকে ভেসে এলো বাঘের ডাক। বাঘের ডাক শোনা যেতেই এবার সাহেব আতঙ্কে, উত্তেজনায়, রাইফেলের দিকে হাত বাড়ালেন। ডাকটা ক্রমশই এগিয়ে আসছিল। বুড়ো বাওয়ালী সাহেবের হাতটা ধরে শান্ত চোখে তাকাল, তারপর মৃদু হেসে বললো, "ভয় কি সাহেব, এই গণ্ডির মধ্যে যমও আসতে পারবে না।"

বাওয়ালী আবার ডাকলো, "আয়... আয়।"

যেন কত চেনা! আপন জনকে ডাকছে, "আয় কাছে আয়।"

আদরে, সোহাগে কণ্ঠস্বর যেন বুজে আসছে বুড়োর! এমন সময় জঙ্গলের ধারে শব্দ হলো। কে যেন প্রবল বিক্রমে ডাল-পালা ভেঙে ছুটে আসছে এদিকপানে। এবার সাহেব দেখতে পেলেন ঝোঁপের আড়াল থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে আসছে। রাগে তার শরীরটা যেন ছিলা পুরানো ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। শরীর দুমড়েমুচড়ে বেঁকে যাচ্ছে, তবু যেন কিছুতেই ফাঁকা জায়গায় আসতে চাইছে না বাঘটা। কে যেন অদৃশ্য দড়ি বেঁধে তাকে টেনে নিয়ে আসছে খোলা প্রান্তরে।

আবার বাওয়ালী মধুর কণ্ঠে বলে উঠলো, "আয় আয়।"

অদৃশ্য আকর্ষণ থেকে যেন মুক্তি নেই বাঘটার। তার সব শক্তিকে অন্য কেউ সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় ব্যবহার করছে। রাগে-ঘৃণায় গজরাতে গজরাতে সে আসছিল।

সাহেবের তখন কোনো হুশ নেই, হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগলেন অভূতপূর্ব

BanglaBook.org

এই ঘটনা। বাঘটা একসময় গণ্ডির ধারে এসে গজরাতে গজরাতে থমকে দাঁড়ালো। চোখের দৃষ্টিতে তীব্র আগুন, তারপরই প্রচণ্ড এক গর্জন করে বনে লাফিয়ে পড়লো বাঘটা। আর তাকে দেখা গেল না। আর বাওয়ালী যেন দীর্ঘ রোগ ভোগে সব শক্তি হারিয়ে ঝিমিয়ে পড়া নিস্তেজ গলায় হাসছে। বুড়ো বয়সে হঠাৎ ছেলেমানুষি কাণ্ড করে ফেললে যেমন অসহায়, অপ্রস্তুতের ম্লান হাসি ফুটে। ঠিক সেইরকম এক লাজুক হাসি ফুটে উঠলো বাওয়ালির পুরু ওষ্ঠে।

পুলিশকর্তা স্যার এডমন এলিসন যতদিন কলকাতায় ছিলেন, ততদিন তিনি বাওয়ালীদের শ্রদ্ধা করতেন।

বাওয়ালী নামের উৎপত্তি হয়েছে 'বাউলে' শব্দ থেকে। বাউলে শব্দের অর্থ ওঝা। ঝাড়, ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করাই এদের কাজ। প্রাচীনকালে সুন্দরবনে কাঠুরে ও মৌয়ালরা জঙ্গলে হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে বাউলে বা ওঝা রাখত। কালের বিবর্তনে এসব কাঠ সংগ্রহকারী কাঠুরে ও গোলপাতা সংগ্রহারীরাই বাওয়ালী নামে অভিহিত হয়। গল্পে বাওয়ালী বলতে জাদুকর তথা ওঝাদেরই বোঝানো হয়েছে। এদের অনেকে আবার টোঙে গুণীন নামেও পরিচিত। বাওয়ালীরা হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেক তন্ত্র-মন্ত্র শিখে নেয়। সব ধর্মের বাওয়ালীরাই সকলে দক্ষিণ রায় ও বনদেবীর পরম ভক্ত। তারা বিশ্বাস করে, দক্ষিণ রায় ও বনদেবী তাদের সর্বদা রক্ষা করে।

এছাড়াও পৃথিবীকে রহস্যের অভাব নেই, লোকচক্ষুর অন্তরালে খেয়ালী প্রকৃতি কখন যে কী খেলা খেলেন সাধারণ মানুষ তার কতটুকু খবর রাখে। সুন্দরবনের কয়েকটা দ্বীপে বনের গভীরে মিষ্টি জলের কূপ আছে। যা নোনাপানির জঙ্গলে এক অলৌকিক ব্যাপার। গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রচণ্ড দাপাদাপি সত্ত্বেও কূপগুলো কিন্তু নষ্ট হয় না। মাত্র তিন চার হাত গভীর গর্তের তলায় কেমন করে যে মিষ্টি জল জমে থাকে তার হদিস কেউ জানে না। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, সুন্দরবনের বাঘও সে খবর রাখে।

এরকম অসংখ্য কিংবদন্তীর গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বনটিকে ঘিরে।

BanglaBook.org

আধ্যাত্মিক সাধক দস্তুর খান

ঐ হেথা এখন যেখানে ক্রমশ বুজে আসা জলাশয়টা মাঠে পরিণত হয়েছে। একদা সে জায়গা জুড়ে ছিলো বিশাল এক দিঘি। এই দিঘির ওপর এখন শুধুই সবুজের ঢেউ খেলে যায়। দিঘিটি কেটেছিল দস্তুর খান। দিঘির নাম দস্তুর খানের দিঘি থেকে কালের বির্বতনে এর নাম হয়েছে দস্তুর খানের মাঠ। দস্তুর খানের আরেকটি বস্তু এখনো বহাল তবিয়তে বিদ্যমান আছে খান বাড়ির মসজিদে। কিন্তু কে এই দস্তুর খান? খান বাড়ির ছোটো ছেলেটার চোখের সামনে যেন সবকিছু পিছিয়ে গেলো কয়েক'শ বছর...

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র তেরো বছর বয়সে মহান মোগল সম্রাট আকবর বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন সম্রাট ভবিষ্যতের পথের কাঁটা মনে করে হত্যা করেছিলেন পিতৃস্থানীয় বিশ্বস্ত বৈরাম খাঁকে। তখন দস্তুর খান ছিলেন তার গৃহশিক্ষক। আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী দস্তুর খান তাঁর আধ্যাত্মিকতা লুকিয়ে রেখে গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

কিন্তু যে আগামীতে অপরাজেয় হবে তার দৃষ্টি কি এড়ানো সম্ভব! শেষ পর্যন্ত তিনি সম্রাট আকবরের দৃষ্টি এড়াতে পারেননি। আকবর খেয়াল করলেন যখন শিক্ষক দস্তুর খানের আশীর্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করেন তখনই সে কাজে সফলতা পান। আর যখন গুরুকে না জানিয়ে কাজ করেন তখনই প্রত্যাশিত সফলতাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রাজ দরবারে সিংহাসনে আসীন সম্রাট আকবর এ রহস্যময় ঘটনার ব্যাপার জানতে চাইলেন দস্তুর খানের কাছে। কিন্তু নিশ্চুপ, নিরব। ক্রোধান্বিত আকবর এবার হুকুম দিলেন দস্তুর খানকে গ্রেপ্তার করার।

BanglaBook.org

দস্তুর খান প্রিয় ছাত্রকে আর্শিবাদ করে নিজেই এগুলেন রক্ষীদের দিকে। পাথুরে কারাগারে বন্দি হলেন শিক্ষক দস্তুর খান।

কিন্তু দস্তুর খানকে আটকে রাখবে এ সাধ্য আছে কার! সম্রাট আকবরের কড়া পাহারা আর পাথুরে দেওয়ালও পারলো না তাকে আটকাতে। একরাতে তিনি তার আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা পাথরের দরজা ভেঙে দু'টুকরা পাথর বগলে করে অলৌকিকভাবে ভাসতে ভাসতে স্বরূপকাঠির সোহাগদল গ্রামে চলে আসেন। অবশ্য তখনো এলাকার নাম সোহাগদল হয়নি। সবুজাভ বৃক্ষ আবৃত এলাকাটিতে ঝিলগাছ, নলখাগড়া, হোগলার বন, বিভিন্ন প্রকার লতাপাতা আর বনজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে অল্পকিছু জনবসতি। মোঘল প্রাসাদে নিয়মানুবর্তিতা, আর দম বন্ধ হওয়া পরিবেশ। হৈ-হুল্লোড় ব্যতিত এরকম গ্রামীণ পরিবেশই তিনি চাইছিলেন।

এবার এখানেই তিনি আস্তানা গড়ে তুলে শুরু করলেন ধর্ম প্রচার। দক্ষিণবঙ্গের বেশির অঞ্চলের পানি তখন ছিল লবাণাক্ত। তেমনি এলাকাতেও খাবার পানির দারুণ অভাব ছিল। ছিল শুধু লবণাক্ত জল আর জল। পানির তীব্র সংকট দূর করতে অলৌকিকভাবে এক রাতের মধ্যে সাত বিঘা জমির ওপর দিঘিটি খনন করলেন। লোকমুখে এ দিঘির নাম হলো দস্তুর খান দিঘি। এবার দিঘির উত্তর পাশে তিনি পাকা সিঁড়ি নির্মাণ করেন। কিন্তু দিঘি তো খনন হলো, পানির যে দেখা নেই। দিঘি খননের সাতদিন অতিবাহিত হবার পরেও একবিন্দু জলও দিঘিতে দেখা দিল না। ধর্মীয় এ সাধক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন, সাদা ঘোড়ায় চড়ে যদি কোনো ব্রাহ্মণের ছেলে এ দিঘিটি সাতবার প্রদক্ষিণ করে তবেই এ দিঘিতে জল উঠবে। পরদিন সকালে তার এ স্বপ্নের কথা অনুসারীদের জানালেন।

হিন্দুরাও সুমিষ্ট পানি প্রাপ্তির আশায় বাওন নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে নিয়ে এলো। তারপর ধর্মসাধকের স্বপ্ন মোতাবেক দিঘির পাড়ে সাদা ঘোড়ার ওপর ব্রাহ্মণের ছেলেকে উঠিয়ে দেওয়া হলো। শুরু হলো সাতবার দিঘি প্রদক্ষিণের দৌড়। সাতবার প্রদক্ষিণ করার সাথে সাথে দিঘি কানায় কানায় জল পরিপূর্ণ হলো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মণের ছেলে বাওয়া সাদা ঘোড়া নিয়ে আর ডাঙ্গায় উঠে আসতে পারলো না। কিন্তু সৃষ্টি হলো হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের।

এর কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণের সেই বাওন নামের ছেলেটি ও সাদা ঘোড়াটিকে শ্রীরামকাঠি, দেহারী ও বেলুয়া নদীর মোহনা দেওদরিয়ার ঝোঁপে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো। ওই স্থান থেকে যে খালটি দেওদরিয়ার সাথে মিলিত হয়েছে সে খালটিকে এখানে লোকে বাওনের > বাওনার খাল বলে।

BanglaBook.org

কিন্তু, সেই যে পালানোর সময় নেওয়া পাথরগুলো কোথায় গেলো?

দিঘিতে পানি আসার পর সাধক দস্তুর খান সবসময় দিঘির ঘাটে সময় কাটাতেন। গভীর রাতে সে পাথর দুটি প্রায় সব সময় দিঘির জলে ভেসে বেড়াতো। অমাবস্যার রাতে দিঘিটি থেকে এক ধরনের মায়াবী সুরও কানে ভেসে আসতে লাগলো। সাধক দস্তুর খান দিঘির পাড়ে বড় ঝিলগাছটির নিচে বসে অধিকাংশ সময় ধ্যান করতেন। আশ্চর্য বিষয়, এই ঝিলগাছটির পাতা কখনো ঝরতো না। কেউ যদি গাছটির পাতা ছিঁড়তো তাহলে তা দিয়ে শুধু লাল লাল রক্ত ঝরতো। তাই ভয়ে লোকজন কখনো গাছটির পাতা ছিঁড়তো না।

এখানেই কি শেষ দস্তুর খানের কথা?

না। এ এলাকায় বড় ধরনের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হলে তখন অনেক থালা-বাসন, হাঁড়ি-পাতিলের প্রয়োজন হতো। কিন্তু মজার ও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, একজন ইমানদার যদি ওজু করে দিঘির জলে কাঁচা দুধের ছিঁটা দিত তাহলে প্রয়োজনীয় থালা-বাসন, হাঁড়ি-পাতিল দিঘির শান বাঁধানো ঘাটে উঠে আসতো। খাওয়াদাওয়া শেষে ওগুলো দিঘির ঘাটে রেখে দিলে দিঘির জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে পুনরায় দিঘিতেই বিলীন হয়ে যেত।

একবার এক মজার ঘটনা ঘটলো, একদিন এক দুষ্ট লোক এর রহস্য জানার জন্য চালাকি করে খাওয়াদাওয়া শেষে দু'তিনটি বাসন গোয়ালঘরে লুকিয়ে রাখলো। কিন্তু প্রতিদিনের মতো বাসন আর দিঘির জলে বিলীন হয় না। এ অবস্থা দেখে উপস্থিত সবাই রীতিমতো অবাক। উপস্থিত জনের মধ্যে একজন গুণে দেখল বাসন কম। এ ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে সবাই বাসন খুঁজতে থাকে। অবশেষে হারানো বাসন গোয়াল ঘরে খুঁজে পায় এবং সেগুলো তৎক্ষণাৎ দিঘির ঘাটে রাখতেই অতীতের মতো বাসনগুলো দিঘির জলে আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু সেই থেকে আর কখনো এ দিঘি থেকে থালা-বাসন উঠতো না।

সাধক দস্তুর খান, দিঘি আর তার পাথর দুটির রহস্য এখানেই শেষ নয়। তার অনুপস্থিতিতে সাত বিঘার এ দিঘিটি আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে যায়। কিন্তু পাথর দুটো পড়ে থাকে দিঘির পাশেই। এভাবে সময় চলতে থাকে হঠাৎ দেখা দেয় বন্যা। চারদিকে পানি থৈ থৈ করে। একদিন খান বংশের এক লোক দুটি পাথরের একটির ওপর বসে মল ত্যাগ করলে সে পাথরটি সাথে সাথে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মহামারি কলেরা। মারা গেলো অসংখ্য মানুষ। এরপর থেকেই সবাই পাথরটিকে সম্মান দিতে শুরু করলো। খান বংশের লোকেরা পাথরটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে। এবং রীতিমতো সম্মান

BanglaBook.org

প্রদর্শন করতে থাকে। গ্রামের অধিকাংশ লোক রোগমুক্তির জন্য এই পাথরটির ওপর কাঁচা দুধ দিত। এবং সাথে সাথে আকস্মিকভাবেই পাথরটি দুধ চুষে নিত। তবে এ প্রথা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কেননা এলাকার মৌলভীরা একে পূজা প্রথা এবং শিরক গুণাহ বলে অভিহিত করলে এ প্রথা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এই পাথরটি খান বাড়ির মসজিদে সংরক্ষিত রয়েছে। পাথরটির দৈর্ঘ্য ৩৭ ইঞ্চি, প্রস্থ ১০ ইঞ্চি আর উচ্চতা ৫ ইঞ্চি। পাথরটি আগের মতো এখন আর দুধ চুষে নেয় না। লোকে বলে এটি একসময় জীবিত ছিল তাই দুধ চুষে নিত, এখন মৃত তাই দুধ চুষে নেয় না। দস্তুর খানের এ কাহিনি শুধু লোকমুখেই নয়, তালপাতা এবং কাঠের বাকলে লেখা হয়।

আধ্যাত্মিক সাধক দস্তুর খান এ এলাকায় বিয়ে করেছিলেন কি না এর কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে অনেকে মনে করেন তিনি এ অঞ্চলে বিয়ে করেছিলেন। এ এলাকায় খান বংশই তার উত্তরসূরি। খান বংশের লোকেরাও তাই বলে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, তিনি বিয়েই করেননি। ধর্ম প্রচার ও ধ্যান মগ্নতার মধ্য দিয়ে তার সময় কাটতো। দস্তুর খান এ এলাকায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন কিংবা অন্য কোথাও চলে গেছেন সে ব্যাপারেও রয়েছে অজানা রহস্য। তবে এখানে তার কোনো মাজার না থাকার কারণে লোকজন ধরে নিয়েছে, কে জানে নিভৃতচারী এই সাধক হয়তো অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন।

খান বাড়ির ছোটো ছেলেটার চোখে ভেসে ওঠে সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ হাসিমুখে তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

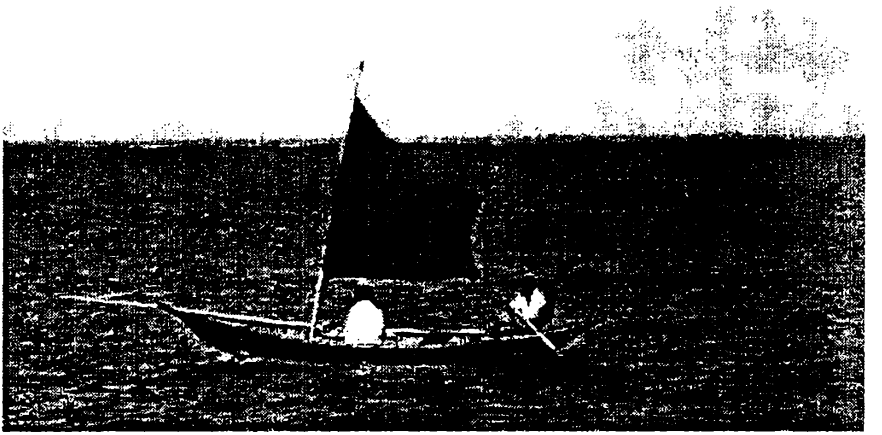

চলনবিলের রবিনহুড : ডাকাত মহর খাঁ

টাঙ্গনের ভরা স্রোতের সাথে পাল্লা দিয়ে তীর্থযাত্রীদের নৌকাটা তরতরিয়ে এগিয়ে চলছে সমান বেগে। দৃশ্যপট পাল্টে দ্রুত মিশে যাচ্ছে দিগন্তে, কমলা রঙা সূর্যটা বসেছে পাটে। দূরে রায়গঞ্জ থানা নলপা গাঁও, এর আশেপাশে দিনেও চলাফেরা করতে দুইবার ভাবতে হয় সবার। এই গ্রামেই টাঙ্গন এসে মিশেছে বিস্তৃত আকূল চলনবিলে। এমন একটি বিল যার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে প্রায় ৪৭ টির মতো নদী।

অভিজ্ঞ মাঝিরা জানে এইদিকেই আশেপাশে মহর খাঁ'র আস্তানা, তাই সন্ধ্যে নামার আগেই গন্তব্যে পৌছুঁতে চায় সবাই। কে এই মহর খাঁ? গরীবের কাছে স্বয়ং দেবতা আর শেঠদের যম মহর খাঁ। লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস মহর খাঁ'র পোষা জ্বিন-ভূত আছে। নইলে এমন ভূতের মতো আচমকা হামলে পড়ে কীভাবে! আবার কোনো গরীব-দুঃখির সাহায্যেও হাজির হয়ে যায় মহর খাঁ!

মহর খাঁ'র প্রধান সাগরেদ নসু একটা উঁচু তালগাছে বসে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো শিকারের আশায়। তীর্থযাত্রীদের নৌকাটা দেখতে পেয়ে হতাশ মনে নেমে এলো নিচে। এত দিনে নসু ঠিক বুঝে নিয়েছে কর্তা কি চায়। নসু নেমে আসছে মহর খাঁ বলে উঠে, "কি রে নইস্যা, পাইলি না কিছু!"

"আজ্ঞে কইত্তা, একখান নাও যাইতাছে, কেন্তু, সে হইলো গিয়া

BanglaBook.org

তের্থযাত্রীগো।" নসু হাত কচলে বলে।

সপ্রসংশদৃষ্টিতে মহর খাঁ বলে, "বাহ্ নসু, ভালা করছস। কিন্তু এমনে কি আর দিন যায়! গা গতরে জং ধইরা যাইতেছে। গঞ্জে যাউন দরকার, দেহি একটারে ধইরা নিয়া আসমু।"

গঞ্জের ঘাটায় এক বৃদ্ধ বামুন অপেক্ষা করছিলো নৌকার। বৃদ্ধের নাম যজ্ঞেরশ্বর। বাড়ি সুদূর কুষ্টিয়া। একমাত্র কন্যার বিয়ের অর্থ যোগাড় করতে না পেরে হাজির হয়েছে পাবনা শহরে। উদ্দেশ্য যদি কিছু টাকা পাওয়া যায়। সারাদিন এখানে ওখানে ধরনা দিয়েও কোনো ফল না হওয়ায় বিফল মনোরথে বাড়ির পথ ধরে বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বর। কিন্তু ঘাটে মোটে একটা নৌকা, তারও মাঝি নেই। বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বর যখন উপায় খুঁজছেন ঠিক তখনই হাজির নৌকার মাঝি, সাথে সঙ্গী এক ষন্ডামার্কা। মাঝি শুধায়, "ও কাহু, কোনে যাইবেন?"

বৃদ্ধ এবার জড়তা ভেঙে বলে, "বাজান, যামু তো বহুদূর। হেই কুষ্টিয়া, কিন্তু নাও পাইতেছি না।"

এবার ষন্ডামার্কা বলে উঠে, "লইয়া ল, সুবহান।"

আর কোনো কথা হয় না। নৌকা চলে একটানা, হাওয়া পেয়ে তরতরিয়ে এগিয়ে চলে ছোট্ট নাও। নৌকাযোগে চলনবিলে যাওয়ার পথে সন্ধ্যা হয়ে আসে। ব্রাহ্মণের মনে অজানা আতংক ভর করে। মাঝিকে তাগাদা দেয় এই বলে, "নাও তাড়াতাড়ি চালাও বাজান। মহর ডাকাইতের দেশ। না জানি কি হয়।"

এবার আলাপে উৎসুক হয়ে উঠে সহযাত্রী। ব্রাহ্মণকে শুধায়, "মহর খাঁরে দেখছেননি কাহু?"

"রাম রাম রাম! কি কউ বাজান। যা শুনছি তাতে কইরা আর তারে দেইখা জীবন খোঁয়াইতে চাই না।"

অল্প হেসে সহযাত্রী আবার বলে, "তা কি কি জানা আছে শুনি এট্টু।"

বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বর, বলতে শুরু করে মহর খাঁ ডাকাতের কথা...

মহর খাঁ আগে ডাকাত ছিলো না। ঘর-সংসার আর একমাত্র কন্যাকে নিয়ে ছিলো মহরের সুখের সংসার। কিন্তু, সে সুখের ঘরে একদিন আগুন লাগলো। ভালো গৃহস্থ ঘর দেখে মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছিল মহর। কিন্তু মেয়েটার শ্বশুড়বাড়ির লোকজন ছিলো খারাপ। পণের টাকা দিতে না পরে একদিন মেয়েটাকে মেরেই ফেললো। খবর পেয়ে মহর সেই যে বল্লমটা নিয়ে বের হলো, একেবারে মেয়ের শ্বশুরের জানটা নিয়ে তবে ফিরলো। এরপর পুলিশ থেকে বাঁচতে ফেরার হলো। কিন্তু তবুও মহর ধরা পড়লো বার কতক।

মহর ডাকাতকে ধরতে পুলিশের অনেক বেগ পেতে হতো। গায়েঁর লোক বিশ্বাস করে মহর ডাকাতকে ধরা চাট্টিখানি কথা না। কারণ সে নাকি যে-কোনো

BanglaBook.org

মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার কব্জায় আছে জ্বীনেরা। একবার পুলিশ মহর ডাকাতের হাতে হাতকড়া পরিয়ে নৌকা দিয়ে থানায় নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝপথে মহর বলে উঠল, "তোমরা একটু শেকল ধরে রাখো, আমি একটু গোসল সেরে নেই।" যেই না ডুব দিল ওমনি সে উধাও। পুলিশ পরে আর তার কোনো খোঁজ পায়নি। সবার সেদিন বিশ্বাস দৃঢ় হলো ঐদিন নাকি মহর অদৃশ্যই হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া মহরকে জেলখানায় আটকে রাখলেও নাকি সে কীভাবে যেন বেরিয়ে যায়। তার বাড়িতে গিয়ে কেউ যদি খাঁ সাহেব বলে হাঁক দেয় তবে তার চারটি ঘর থেকে একসাথে উত্তর পাওয়া যায়। এরকম আরো কত অদ্ভুত কিসসা বলে লোকে।

নিবিষ্ট মনে বুড়ো ব্রাহ্মণের গল্প শুনছিল সহযাত্রী ও নৌকার মাঝি। যজ্ঞেশ্বরের গল্প শেষ হতেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো দু'জনে। যজ্ঞেশ্বর কিছুটা অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসে। মনে মনে ভাবে এরা এমন করে হাসে ক্যান? মহর খাঁ'র সাগরেদ না তো আবার! ধুতির খুঁটে সম্বল কতক কড়ি। হাসি স্তিমিত হয়ে আসলে সহযাত্রী ব্রাহ্মণে লক্ষ করে বলে, "আরে কাহু মহর খাঁ রে ডরান ক্যান, হে গরীবের ক্ষতি করে না। তা আপনে এই বয়সে এতদূর ক্যান আইসেন?"

যজ্ঞেশ্বরের মন খারাপ হয়ে যায়। গল্পের তালে মেয়েটার মুখটা ভেসে উঠে। পণের টাকা না পেলে বিয়ে হবে না মেয়েটার। একটু ইস্তক করে সব কিছু বলে সহযাত্রীকে। কিছু না বলে সহযাত্রী মাথা নাড়ায়। আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ। এক সময় কুষ্টিয়া এসে পৌঁছায় নৌকা। ক্লান্ত মনোরথে বাড়ির পথ ধরে বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বর।

মাথায় হাত দিয়ে বাড়ির দাওয়ায় বসে ছিলো যজ্ঞেশ্বর। মাত্র আর দুইদিন বাকি বিয়ের কিন্তু টাকার ব্যবস্থা এখনো হয়নি। কি যে করবেন, তিনি ভেবে পান না।

চটকা ভাঙে অচেনা পদশব্দে। তারপর একসময় দৃষ্টিগোচর হয় আগন্তুকের। কেমন জানি চেনা চেনা ঠেকে যজ্ঞেশ্বরের। হঠাৎ চকিতে মনে পড়ে যায়। পাবনা থেকে ফেরার সময় এই লোকটাই তো সহযাত্রী ছিলো তার! কিন্তু আফসোস নামটি জেনে নেওয়া হয়নি তখন। এখন এই দিনের আলোয় তার সুঠাম দেহ পল্লবী তাকে সুদর্শন করে তুলতেছে। যজ্ঞেশ্বর তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়ায়। আগন্তুকও ততক্ষণে তার কাছাকাছি এসে গেছে। ওষ্ঠে স্মিত হাসির রেশ লেগে আছে তার। তারপর কোনো কিছু না বলে একটা ছোট্ট কাপড়ের পুটলি এগিয়ে দেয় যজ্ঞেশ্বরের দিকে। বৃদ্ধ বামুন হাত দিয়ে বুঝতে পারে তাতে আছে টাকা! আগন্তুক এবারো কোনো কথা না বলেই ফেরার পথ ধরে। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে বৃদ্ধ বামুন, তারপর হঠাৎ দৌড়ে এসে আগন্তুকের হাত দু'টি চেপে ধরে বলে, "কে তুমি বাবা? এই অভাগারে নতুন জীবন দিলা?"

BanglaBook.org

আগন্তুক হেসে বলে, "আপনি সেদিন যে ভয়ঙ্কর ডাকু মহর খাঁ'র গল্প বলতেছিলেন, আমিই সেই। কন্যার ধুম ধাম কইরে বিয়া দিবেন। আর যে-কোনো দরকারে স্মরণ করলেই আমি চইলা আসমু।" একথাটা বলেই ভয়ঙ্কর ডাকু মহর খাঁ দ্রুত পা চালায়।

হতভম্ব যজ্ঞেশ্বর বিহ্বল হয়ে বলে উঠে, "জয় মহর খাঁ'র জয়। তুমি মানুষ না বাজান, তুমি দেবতা। তুমি গরীব মানুষের দেবতা।"

ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে মহর খাঁয়ের মহানুভবতা। গায়কেরা বাঁধে গান, হয় পালা... কান পাতলে শোনা যায়। সন্ধ্যার নোনা বাতাসে ভেসে আসে একতারার টুংটাং ধ্বনি আর মায়াবি কণ্ঠের গান–

অমাবস্যার রাত্রিরে ভাই
নিঝুম চরাচর,
নায়ে কইরা খেয়া পার হয়
বামুন যজ্ঞেশ্বর।
গিয়েছিল শহরেতে
সাহায্যের আশায়,
গৃহেতে কুমারী কন্যা
বর নাহি পায়।
পণের টাকা যোগানে যে
অক্ষমি শহরে
ভয় মনে অসময়ে
বাড়ির পথে ফিরে।
মহর ডাকাত রে...

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

কবি চন্দ্রাবতীর প্রেমকথা

গৌড়ে সেনরাজাদের রাজত্বের অবসান ঘটেছে বহুকাল হলো কিন্তু তাদের আমল থেকে প্রসারিত কাব্যচর্চা এখনো স্বগর্বে টিকে আছে। ফুলেশ্বরী নদীর তীরবর্তি ছায়াঢাকা,পাখিডাকা ছোট্ট সবুজ গ্রাম পাতুয়াইর। এই শান্ত পরিবেশে

দ্বিজবংশী দাশের এই টোল। দ্বিজবংশী নিজেও বিখ্যাত কবি। তার সৃষ্ট মনসামঙ্গল কাব্যের চরণগুলো পথে প্রান্তরের মানুষের মুখে মুখে গান হয়ে ফোটে। তার কন্যা চন্দ্রাবতী। দ্বিজবংশী তার অন্যান্য সন্তানদের থেকে চন্দ্রাবতীকে অধিক স্নেহ করেন। এর অন্যতম কারণ চন্দ্রাবতীর কাব্যপ্রেম, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা। চন্দ্রাবতীর যা প্রতিভা আছে তাতে পিতাকেই ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। দ্বিজবংশীর প্রিয় ছাত্র আরো একজন আছে, যে সমপ্রতিভার অধিকারী। সে জয়নন্দ চক্রবর্তী। পাতুয়াইর পাশ্ববর্তী গ্রাম সুন্ধায় বাড়ি জয়নন্দের। ছোটোবেলায় বাবা-মা গত হয়েছেন, তাই তিনি স্থান পেয়েছে মাতুলগৃহে।

দ্বিজবংশীর শরীরটা বেশ খারাপ লাগছিলো, তিনি চন্দ্রাবতীকে বললেন, "মা, যা তো পূজার জন্য ফুল নিয়ে আয়।"

চন্দ্রাবতী ছুটল টোলের পাশেই পুকুরধারে ফুল পাড়তে। জয়নন্দের অভ্যাস ছিলো সকাল সকাল টোলে আসা। চন্দ্রাবতী নিবিষ্ট মনে ফুল তুলছে আর গান

BanglaBook.org

গাইছে। জয়নন্দ এমন সুমিষ্ট কণ্ঠের গান শুনে, আর ভাবে কে গায়! পুকুর পাড়ে চোখ পড়তে পায় একটি সুন্দরী বালিকা একমনে ফুল তুলছে।

কাব্যরসিক জয়নন্দ গেয়ে উঠে–

"চারইকুনা পুষ্করিণীর পাড়ে চম্পা নাগেশ্বর,
ডাল ভাইঙা পুষ্প তোল কে তুমি নাগর?"

চমক ভেঙে চন্দ্রাবতীও গেয়ে উঠে–

"দ্বিজবংশীর কইন্যা আমি, চন্দ্রাবতী নাম,
দেব সেবায় পুষ্প তুলি, নিবা নাকি দাম?"

চন্দ্রাবতীর টিটকারিতে দুজনেই হেসে উঠে একসাথে। জয়নন্দ ফুল তুলতে সাহায্য করে চন্দ্রাবতীতে। ভাব হয় দুটি বালক-বালিকার।

এমনি করে দিন যায় দু'জনার। বাল্যকালের খেলার সঙ্গী জয়নন্দ ও চন্দ্রবতীর কাব্যচর্চা চলে একসাথে। সেই যে পুষ্পবনে শিবপূজার ফুল তোলার সময় পরিচয় ও সখ্যতা ঘটে তা আরো গভীর হয়। দু'জনে মুখে মুখে কত পদ রচনা করে! এমন কি চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজবংশীর অনেক রচনায় এই দুজনার রচিত ছোটো ছোটো অনেক পদ স্থান পেতে থাকে। দেখতে দেখতে বালিকা চন্দ্রাবতী ষোড়শী হয়। সেই সঙ্গে তার রূপ ও গুণের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কত জায়গা থেকে, কত বড়ো পরিবার থেকে আসতে শুরু করে বিয়ের প্রস্তাব। কিন্তু মন যে বাঁধা বাল্যকালের সঙ্গী জয়নন্দের কাছে। জয়নন্দও বাঁধা পড়ে চন্দ্রাবতীর মনে। একদিন নির্জনে জয়নন্দ গেয়ে উঠে–

"ফুল তুলো ফুল তুলো কন্যা,
তুমি ফুলের রাণী,
ঐ না ফুলের সঙ্গে বান্ধা আমার পরাণী।"

BanglaBook.org

চন্দ্রাবতী লজ্জা পেয়ে দৌড়ে চলে যায় অন্দরে। জয়নন্দ খুশি মনে চন্দ্রাবতীকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় গুরুর কাছে। দ্বিজবংশী নিজেও পছন্দ করতেন জয়নন্দকে। খুশি মনে রাজি হলেন তিনি। বিবাহের দিনও স্থির হলো।

জয়নন্দ খুশি মনে চলেছে নদীর ঘাটে গোসল করতে। কিন্তু থমকে দাঁড়ায় ঘাটে অপরূপা এক তরুণী দেখে। স্থানীয় মুসলমান কাজীর মেয়ে আসমানী ঘাটে এসেছিল সখিদের নিয়ে। অসামান্য রূপে মুগ্ধ হলেন ব্রাহ্মণপুত্র জয়নন্দের। গোসল করা আর হলো না জয়নন্দের। ছুটলেন বাড়ির পানে। যতবার চোখ বন্ধ করে, ভেসে উঠে হাস্যরত আসমানীর বদন। কাব্যচর্চা, চন্দ্রাবতী কিছুই আর

ভালো লাগে না জয়নন্দের। না পেরে এবার জয়নন্দ আসমানীকে প্রেমপত্র দিলে লাগলেন। কিন্তু এর ফলাফল হলো মারাত্মক। জয়নন্দের সাথে চন্দ্রাবতীর প্রেমের কথা জেনেও আসমানী তার পিতাকে বললো সে জয়নন্দকে বিবাহ করতে চায়। কন্যা অন্তপ্রাণ কাজী তৎক্ষনাৎ জয়নন্দকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করলেন। জয়নন্দ হলো জয়নুল। এরপর কাজী মহা ধুমধামে আসমানীর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। জয়নুল ও আসমানীর বিয়ের দিনটিই হবার কথা ছিলো "জয়নন্দ ও চন্দ্রাবতীর" বিয়ের দিন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা চন্দ্রাবতী বধূ হয়ে অপেক্ষায় ছিলো প্রিয় সখার। দ্বিজবংশী ভগ্ন হৃদয়ে জয়নন্দের ধর্মান্তরিত হয়ে অন্যত্র বিয়ের সংবাদ আনলেন । ঘটনার আকস্মিতায় হতভম্ব চন্দ্রাবতী–

"না কাঁদে, না হাসে চন্দ্রা নাহি কহে বাণী।
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী।
মনেতে ঢাকিয়া রাখে মনের আগুনে।
জানিতে না দেয় কন্যা জ্বলি মরে মনে।"

এরপর শুরু হলো চন্দ্রাবতীর বিরহ-বিধুর জীবন। কন্যার এই হাল দেখে বিচলিত হয় দ্বিজবংশী। তিনি আবার কন্যার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে যান। কিন্তু চন্দ্রবতী পিতার কাছে আর্জি করলেন আজীবন চিরকুমারী থাকার। তিনি দ্বিজবংশীর কাছে অনুরোধ করলেন, একটি শিব মন্দির বানিয়ে দেওয়ার। যেখানে তিনি শিবের সাধনায় আত্মনিবেদন করবেন । পিতা তার জন্য ফুলেশ্বরী নদীর তীরে একটি শিব মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিলেন। শুরু হলো চন্দ্রাবতীর নতুন জীবন। তিনি একমনে, শিবের আরাধনা করেন সেই সাথে চলে কাব্যচর্চা। একে একে জন্ম নিলো দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারাম, মলুয়া পদ্মপুরাণ প্রভৃতি কাব্যগীতি।

ইতোমধ্যে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর জয়নন্দ বুঝতে পারে, আসমানীর প্রতি তার টানটা ছিল মোহ মাত্র । মন থেকে তিনি চন্দ্রাবতীকেই প্রকৃত ভালোবাসেন। হায় হায় করে ওঠে জয়নন্দ। চন্দ্রাবতীকে দেখার জন্য আনচান করে মন। অনুতপ্ত জয়নন্দ স্থির করে চন্দ্রাবতীকে তার মনের কথা জানাবেন। একদিন মনের সব বাঁধা ফেলে ছুটে যায় চন্দ্রাবতীর মন্দির প্রাঙ্গনে। কিন্তু হায়, বন্ধ কপাট! জয়নন্দ চন্দ্রাবতীকে পত্র লিখে–

"শুন রে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই।
মনের আগুনে দেহ পুড়্যা হৈছে ছাই।

শিশু কালের সঙ্গী তুমি যৌবন কালের মালা।
তোমারে দেখিতে মন হৈয়াছে উতলা।

BanglaBook.org

... ...
ভালো নাহি বাসো কন্যা এ পাপিষ্ঠ জনে।
জন্মের মতন হইলাম বিদায় ধরিয়া চরণে।
একবার দেখিয়া তোমা ছাড়িব সংসার।
কপালে লিখেছে বিধি মরণ আমার।"

পত্র পড়ে চন্দ্রাবতীর সংকল্পিত ব্রহ্মচর্য, অবিচলিত সংযম ও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। অশ্রুসিক্ত বদনে তিনি পিতার কাছে বিধান চাইলেন। কন্যার মানসিক শিথিলতা মেটাতে দ্বিজবংশী তাকে সান্ত্বনা দিলেন–

"তুমি যা লইয়াছ মাগো সেই কাজ কর।
অন্য চিন্তা মনে স্থান নাহি দিও আর।"

কন্যার মনের অস্থিরতা কমাতে দ্বিজবংশী চন্দ্রাবতীকে রামায়ণ রচনার নির্দেশ দিলেন।

জয়চন্দ্রকে পত্রদ্বারা নিষেধ করে চন্দ্রাবতী যোগাসনে বসে মনের সমস্ত অর্গল রুদ্ধ করলেন তাঁর চোখের জল শুকিয়ে গেল। শিব-ধ্যানে আত্মহারা হয়ে তিনি সমস্ত জাগতিক জ্ঞান লুপ্ত হলেন। শুরু করলেন পিতৃদেশে রামায়ণ রচনা।

এক সন্ধ্যায় জয়চন্দ্র ও চন্দ্রাবতীর বিচ্ছেদ হয়েছিল; অপর সন্ধ্যায় সেই বিচ্ছেদ মুছে গিয়ে মিলন হবে দুজনার, এই আশায় জয়নন্দ আবার রওনা দিলো চন্দ্রাবতীর মন্দিরে। জয়নন্দ যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছলেন তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ। শিব মন্দিরের ভেতর দ্বার রুদ্ধ করে সন্ধ্যারতি ও তপজপে নিজেকে নিবদ্ধ করেছেন চন্দ্রাবতী। জয়নন্দ মন্দিরের দ্বারে এসে কয়েকবার ডাকলেন চন্দ্রাবতীকে। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ থাকায় এবং একাগ্রমনে ধ্যানে নিমগ্ন থাকায় সেই শব্দ প্রবেশ করল না চন্দ্রাবতীর কানে। ব্যর্থ প্রেমিক জয়নন্দ তখন লালবর্ণের সন্ধ্যামালতী ফুল দিয়ে মন্দিরের দ্বারে চারছত্রের একটি পদে চন্দ্রাবতী ও ধরাধামকে চিরবিদায় জানিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

"শৈশব কালের সঙ্গী তুমি যৌবন কালের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী।
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলে সম্মত।
বিদায় মাগী চন্দ্রাবতী জনমের মত।"

কিছুই বুঝতে পারলো না চন্দ্রাবতী। কিছু সময় পরে মন্দির থেকে বেরিয়ে

BanglaBook.org

চন্দ্রাবতী মন্দির পরিষ্কার করার জন্য কলসী কাঁখে জল আনতে পার্শ্ববর্তী ফুলেশ্বরী নদীতে গেলেন । দেখতে পেলেন হতভাগা জয়নন্দের প্রাণহীন দেহ ভাসছে ফুলেশ্বরীর জলে। ফুলেশ্বরীর জলে নিজেকে নিমগ্ন করে প্রাণত্যাগ করেছেন জয়নন্দ।

এই অবস্থায় নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারলো না চন্দ্রাবতী। অচিরে প্রেমিকের সাথে পরলোকে চিরমিলনের কামনায় ফুলেশ্বরীর জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করলেন চন্দ্রাবতী।

"একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাই কেহ।
জলের ওপরে ভাসে জয়চন্দ্রের দেহ।
দেখিতে সুন্দর কুমার চাঁদের সমান।
ঢেউ-এর ওপরে ভাসে পৌর্ণ মাসী চাঁদ।
আঁখিতে পলক নাই! মুখে নাই বাণী।
পারেতে দাঁড়াইয়া দেখে উন্মত্তা কামিনী।"

চন্দ্রাবতী ষোড়শ শতাব্দীর কবি এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি মহিলা কবি। এই বিদূষী নারী অন্যান্য কাব্য ছাড়াও পিতার আদেশে বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে, মৈয়মনসিংহ গীতিকার এক কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ চন্দ্রাবতী চরিতকথা রচনা করেন। জয়নন্দের গ্রাম সুদ্ধা খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত পাতুয়াইর/পাটোয়ারী গ্রাম আজও আছে। কিশোরগঞ্জ শহর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে। আর আছে ফুলেশ্বরী নদীর ধারে চন্দ্রাবতীর পূজিত শিব মন্দির।

BanglaBook.org

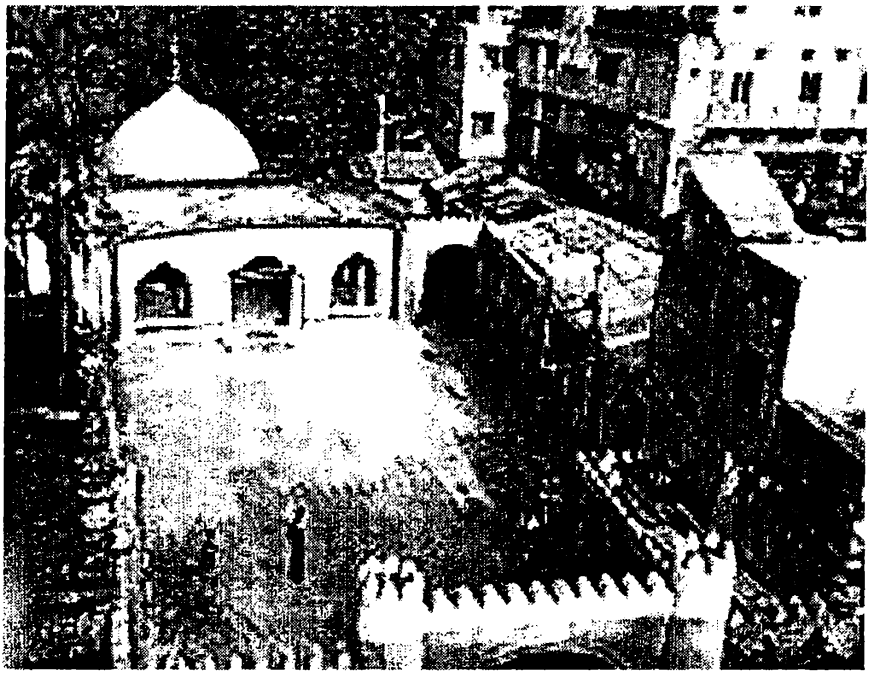

বদর পীরের অলৌকিক চেরাগ

আজ থেকে কয়েক'শ বছর আগে সুফি সাধকেরা যখন উর্বর বাংলায় আগমন করলেন, তখন এর বেশির ভাগ অঞ্চল ছিলো বুনো জঙ্গলে ছাওয়া। এর বেশির অধিবাসী ছিলো অসভ্য যাযাবর গোষ্ঠী।

এমনই এক জায়গার খোঁজে সুদূর আরব দেশ থেকে বদর আউলিয়া (রাঃ) সমুদ্রে ভাসমান একটি পাথর খণ্ডে আরোহণ করে পূর্বদিকে গমন করলেন। একদিন পাথরখণ্ডটি বদর শাহকে নিয়ে কর্ণফুলী নদীতে প্রবেশ করলো। তারপর নির্জন একটি স্থানে পাথরটি থেমে গেলো।

জনমানবহীন নিস্তব্ধ গভীর পাহাড়-পর্বতে ঘেরা এবং জনমানবহীন স্থানটি যে কারো বুকে কাঁপন ধরায়... নির্ভীক বদর শাহ্'র মনেও কি কাঁপন ধরেনি এতটুকু? তিনি সারাজীবন পথে-ঘাটে ঘোরা মানুষ। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে নানান আজব ঘটনা তার জানা। তিনি মূলত ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আর নিভৃতে নির্জনে আল্লাহর ইবাদত করতে এখানে এসেছিলেন। বদর শাহ্ আগেই এদেশ ফেরত শিষ্যদের কাছে শুনেছিলেন বিপদসংকুল ভয়ঙ্কর এই জায়গার। তিনি শুনেছিলেন এটা জ্বীন-পরীদের আবাসস্থল। আর তাই তার আগ্রহটা আরো বেড়ে যায়। তারই জন্য আজ তিনি এখানে।

BanglaBook.org

দিনের আলো ফুরিয়ে গেছে আরো কিছুক্ষণ আগে। ঘন বনে আচ্ছাদিত জমিন আরো কালিগোলা অন্ধকার লাগে। তবু একাগ্রতা চিত্তে এগিয়ে চলছেন বদর শাহ্। সামনেই একটি দীর্ঘ পাহাড়। উদ্দেশ্য রাত্রিবাস ও ওখান থেকে গোটা জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু বারবার তার মনে হতে লাগলো কারা যেন তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। একসময় পাহাড়ে উঠলেন বদর শাহ্। কিন্তু একি! চারদিক যেন রংবেরঙের মেলা বসেছে! সাদা লেবাস পরা জ্বীনেরা, ডানা লাগানো অপূর্ব সুন্দরী পরীর দল যেন তারই অপেক্ষায় ছিলো। কিন্তু কারো মুখে হাসি নেই, তাদের শান্তির স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্রে কোনো মানুষের স্থান দিতে চায় না। জ্বীনেদের একটা দল বদর শাহকে নিয়ে গেলো তাদের বাদশাহর কাছে। জ্বীনের বাদশাহ তখন সবে সিংহাসনে বসেছেন। বদর শাহকে দেখে বললেন, "তুমি কে? এখানে কেন এসেছো?"

বদর শাহ্ বলেন, "হে মহামান্য, আমার নাম হজরত বদর শাহ্। এসেছি সুদূর আরবদেশ থেকে। স্থান চাই বাস করার।"

জ্বীনের বাদশাহ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, বলল, "খামোশ! জানো না এখানে মানুষের প্রবেশ ও বাস করার অধিকার নেই!"

বদর শাহর ওষ্ঠে হাসির লহরী ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, "হে মহামান্য বাদশাহ্, অনেকদূর ভ্রমণ করে এসেছি, তা ছাড়া অন্ধকারও হয়েছে। দয়া করে আজকের রাতটুকু ও চাটি(মাটির প্রদীপ)রাখার জমিন দান করুন।"

জ্বীনের বাদশা বললেন, "ঠিক আছে, তবে মনে রেখো তোমার চাটির (মাটির প্রদীপ) আলো ঠিক যতটুকু ছড়াবে ততটুকু জায়গা তোমার হবে।"

জ্বীন-পরীরা তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করায় বদর শাহ এবার পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলেন।

হজরত বদর আউলিয়া একটি অলৌকিক চেরাগ সাথে নিয়ে এসেছিলেন। পাক-পবিত্র হয়ে সেটি হাতে নিয়ে তিনি পাহাড়ের চূড়ায় তার অলৌকিক চাটিখানা জ্বেলে দিলেন। ধীরে ধীরে এর রশ্মিতে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠলো। এই পবিত্র রশ্মি এতটাই শক্তিশালী ছিলো যে আশেপাশের কোনো অঞ্চল অন্ধকার রইলো না। পবিত্র রশ্মির এতই তীব্র তেজ ছিলো যে জ্বীনদের শরীর খসে পড়তে লাগলো। পরীদের ডানাগুলো পুড়ে গেলো। একসময় আর তার তীব্র তেজ সহ্য করতে না পেরে জ্বীন-পরীরা পালাতে লাগলো।

এই অলৌকিক রশ্মি দেখে লোকেরা দৌড়ে এলো পাহাড়ের চূড়ায়। দেখলো সৌমদর্শন বদর শাহ্ চাটির সামনে ধ্যানে বসা। তারপর একসময় এক ঘর দু ঘর করে শুরু হলো বসতি।

BanglaBook.org

এভাবেই হযরত বদর শাহ্ পীর(রহঃ)ঘন জঙ্গলে ঘেরা চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলকে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী করে তুললেন। জন্ম নিলো বারো আউলিয়ার শহর চট্টগ্রাম। এইভাবে, চট্টগ্রাম শহর বদর পীরের চাটি দিয়ে আলোশিখা বিকিরণ করায় এবং এই জেলাকে সর্বপ্রথম মানুষের বাসোপযোগী স্থানে পরিণত করায় একে 'চাটিগ্রাম' বা 'চাটগাঁও' নামে অভিহিত করা হয়।

লোককথা অনুসারে পূর্বে চট্টগ্রামের পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলে জ্বীন-ভূত-প্রেতের বসতি ছিল। চট্টগ্রামের অধিবাসীগণ এখনো কোনো কোনো পাহাড়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তাকে 'পরীর পাহাড়' নামে অভিহিত করেন। পীর বদরের ভক্তগণ তাকে চট্টগ্রাম শহরের 'অভিভাবক দরবেশ' বলে থাকেন। 'বদর পীরের চাটির' কথা আজও চট্টগ্রামে কিংবদন্তী হয়ে আছে। 'বদর শাহের চাটি' থেকে চাটিগ্রাম>চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়েছে মর্মে বিশেষজ্ঞগণের বেশ জোরালো অভিমত রয়েছে।

চট্টগ্রামের মোমিন রোডের কদম মুবারক মসজিদের উত্তর দিকে অবস্থিত, যে পাহাড়ের ওপর তিনি প্রথম চাটি প্রজ্বলন করেছিলেন, সেটি বর্তমানে চেরাগীর পাহাড় নামে পরিচিত। হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিস্টান জনসাধারণ এখনো মনোস্কামনা পূরণের জন্য এ স্থানে প্রতি সন্ধ্যায় আলো জ্বেলে থাকে।

মায়ানমারের টেনাসেরিমের জনগণ বদর শাহ মাদরা বলে ডাকত। আকিয়াবের অধিবাসীদের কাছে তিনি বুদ্ধ আউলিয়া বা বুদ্ধ সাহেব হিসেবে পরিচিত। চট্টগ্রামের অধিবাসীরা তাকে বিভিন্ন নামে ডাকে যেমন, বদর আলম, বদর আউলিয়া, বদর পীর বা পীর বদর ও বদর শাহ। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম 'শাহ বদর আলম' হিসেবে পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

ভাওয়াল গড়ের সন্ন্যাসী রাজা

(১)

চারজন নাগা সন্ন্যাসীর একটা দল ঘুরতে ঘুরতে দার্জিলিংয়ের মহাশ্মশানে আস্তানা গেড়েছে। রাতের প্রথম প্রহরে দলটি ধর্মালোচনা করছিল। ঝড়-বৃষ্টির দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। এমন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে মরা নিয়ে আসা এক আশ্চর্য ঘটনাই বটে। সন্ন্যাসীর দলটি গুহা থেকেই শুনতে পাচ্ছিল একদল লোক হরিবোল ধ্বনিতে শ্মশানে জমায়েত হয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে সন্ন্যাসীদলের গুরু ধরম দাস নাগা লণ্ঠন নিয়ে গুহা ছেড়ে বাইরে এলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, শ্মশানের কোথাও থেকে মানুষের কাতরানোর আওয়াজ শুনতে পেলেন। কাতরানোর শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে ধরম দাস দেখতে পেলেন এক লোক খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছে। সে জ্বরে এবং ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। গুরু লোকটার নাকে হাত দিয়ে বললেন, "লোকটা বেঁচে আছে, একে ধর, গুহায় নিয়ে চল।" পাহাড়ের নিচ দিকে একটা ঘর ছিল, বৃষ্টি ক্রমেই বাড়ছে বলে সন্ন্যাসী সবাই তাকে নিয়ে ওই ঘরটার কাছে নিয়ে গেল। ঘরে তালা লাগানো, কিন্তু কাউকে না দেখে লোকনাথ বাবা বললেন, তালা ভেঙে ফেল। পরদিন লোকটির জ্ঞান ফিরে এলো।

ধরমদাস বললো, "বেটা, তোর বাসা কোথায়?"

কয়েকবার জিজ্ঞাসা করার পরেও জবাব মিললো না।

ইতোমধ্যে কয়েকদিন গত হয়েছে। সন্ন্যাসী দলের দার্জিলিং ছাড়ার সময় আসন্ন। কিন্তু অপরিচিত লোকটাকে কি করা যায়। এবার আরেক সন্ন্যাসী

BanglaBook.org

অঘোরীবাবা বললেন, "ঈশ্বর যখন পাঠিয়েছে এখানে, নিয়ে নে তবে।"

খোলা প্রান্তর দিয়ে হেঁটে যায় সন্ন্যাসীর দল। এরা নাগা সন্ন্যাসীর দল, গায়ে ছাই মেখে, ছোট্ট একটা নেংটি বেঁধে ঘুরে বেড়ায় সর্বত্র। শীত, গ্রীষ্ম এই তাদের পোষাক। পথই এদের ঘর। এই দলটাই দার্জিলিং এসেছিল বেশ কিছুদিন আগে। চারজনের দলটি পাঁচজনে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে একজনকে সম্পূর্ণ আলাদা লাগে। ছাইমাখা দেহের অনাবৃত অংশ সদ্যগত গৌরবর্ণের সাক্ষর রাখে। মাথায় জটা, পরনে নেংটি। অনভ্যস্ত খালি পায়ের পদক্ষেপ। মাঝে মাঝে দু'চোখ হারিয়ে যায় সুদূর অতীতে। তখন বারবার ডেকেও সাড়া মেলে না ওর। বড়ো মায়া লাগে ধরম দাসের। না জানি কোন মায়ের সন্তান, তবে বড়ো কোনো ঘরের যে হবে তা নিশ্চিত। প্রায় ধরম দাস ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। "হে ঈশ্বর! ঘরের ছেলে যেন ঘরে ফিরে যায়।"

(২)

অবিভক্ত ভারতবর্ষের বাংলা প্রদেশের ভাওয়াল এস্টেট। বহুকাল পূর্বে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীর হতে ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা পার হয়ে সুসং দূর্গাপুর পাহাড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের মধ্যে 'জয়ানশাহি' নামে একটি গহীন অরণ্য অঞ্চল ছিল। এর উত্তরাংশকে বলা হতো 'মধুপুরের অরণ্য অঞ্চল' এবং দক্ষিণাংশকে বলা হতো 'ভাওয়ালের অরণ্য অঞ্চল'। উত্তর-দক্ষিণে এই অরণ্য অঞ্চলের দৈর্ঘ্যে ছিল পঁয়তাল্লিশ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থে ছিল ছয় থেকে ষোল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কালে প্রায় ছয়'শ বছর পাঠান ও মুঘলরা এদেশ শাসন করে। তাদের আমলে এই আরণ্যকের মাঝখানে গড়ে উঠে এক প্রশাসনিক অঞ্চল, যেটা সেখানকার স্থানীয় মানুষের কাছে 'ভাওয়াল পরগণা' নামে পরিচিত।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে মুর্শিদকুলী খান বহু মুসলমান জমিদারকে বিতাড়িত করে সে স্থলে হিন্দু জমিদার নিযুক্ত করেন। তেমনি, দৌলত গাজীর দেওয়ান বলরাম ও তার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে ভাওয়াল পরগণার জমিদারিত্ব লাভ করেন। এরপর জয়দেব নারায়ণ, ইন্দ্র নারায়ণ, কীর্তি নারায়ণ, গোলক নারায়ণ ও কালি নারায়ণ যথাক্রমে জমিদারিত্ব ভোগ করেন।

রাজা কালি নারায়ণ রায় চৌধুরীর তিন স্ত্রীর মধ্যে ছোটো স্ত্রীর নাম ছিল রাণী সত্যভামা দেবী। অপর দুই স্ত্রী ছিলেন রাণী যামিনী দেবী এবং রাণী ব্রহ্মময়ী দেবী। কিন্তু শেষোক্ত এই দুই রাণী ছিলেন একদমই নিঃসন্তান। অপরদিকে রাণী সত্যভামা দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন পুত্র রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী

BanglaBook.org

এবং কন্যা রাণী কৃপাময়ী দেবী। পিতার মৃত্যুর পর রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী বংশানুক্রমে ভাওয়ালের রাজা হলেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন বরিশাল জেলার বানারিপাড়ার অত্যন্ত গুণবতী কন্যা 'রাণী বিলাসমণি দেবী'কে। রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী পিতার ন্যায় যোগ্য ও কৌশলী জমিদার ছিলেন। রাজা উপাধিতে ভূষিত রাজেন্দ্র নারায়ণ বিখ্যাত কবি 'কালি প্রসন্ন ঘোষ, বিদ্যাসাগর এবং সি.আই.ই'-কে ভাওয়ালের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন। এবং এই মেধা এবং যোগ্যতা বলে অতি শ্রীঘ্রই তিনি তার জমিদারির আরো বিস্তৃতি ঘটান। আর এই সময়েই ভাওয়ালের জমিদারি স্টেটটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ জেলায় বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং পূর্ববঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম জমিদারিতে পরিণত হয়।

রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের ছিলো তিনকন্যা–ইন্দুময়ী দেবী, জ্যোর্তিময়ী দেবী ও তড়িন্ময়ী দেবী। তিন পুত্র রণেন্দ্র নারায়ণ, রমেন্দ্র নারায়ণ ও রবীন্দ্র নারায়ণ।

রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর নাবালক সন্তানদের নিয়ে রাণী বিলাসমণি বিশাল ভাওয়ালগড় জমিদারির দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। কুমারেরা যত বড়ো হতে লাগলো ততই ভোগ বিলাসে ডুবে যেতে লাগলো। রাণী বিলাসমণি পুত্রদের সুশিক্ষিত করতে কুমারদেরকে লেখা পড়া শেখানোর জন্য মিস্টার হোয়াটন নামের একজন গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। তারা লেখা পড়ার থেকে আনন্দ ফূর্তি করতেই মূলত বেশি মজা পেতো। বড়ো কুমার রণেন্দ্র জমিদারি পরিচালনার প্রয়োজনীয় কাজ চালানোর মতো টুকটাক ইংরেজি শিখলেন। রমেন্দ্র শিখলেন কোনোমতে সাক্ষর করা আর রবীন্দ্র রইলেন পুরোপুরি গণ্ডমূর্খ।

(৩)

রাণী বিলাসমণির মৃত্যুর সাথে সাথে ভাওয়াল গড়ের জমিদার বাড়িতে শুরু হলো প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। কর্মচারী, আত্মীয়-স্বজন সবাই সবার আখের গুছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এস্টেটের ম্যানেজার বিখ্যাত সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ নিজের বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধিতে এতটাই লোভী হয়ে পড়েন যে, রাজা রমেন্দ্রনারায়ণকে নিজ স্বার্থে তিনি ভোগবাদের নোংরা দিকে ঠেলে দেন এবং এতে রাজকোষের অবস্থা দ্রুত খারাপ হতে থাকে।

অবশেষে তিন কুমার সমান হিস্যায় ভাওয়াল এস্টেটের মালিকানা পেলেন। ইতোমধ্যে রাণী বিলাসমণি তার মৃত্যুর আগেই পুত্র-কন্যা সবাইকে বিয়ে দিয়েছিলেন। মেজো কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ দেখতে ছিলেন সুপুরুষ, জমিদার

BanglaBook.org

হিসেবে এটাই ছিলো তার একমাত্র সম্পদ। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো গুণাবলির অধিকারী তিনি ছিলেন না। গান-বাজনা, বাঈজী নাচ, মদ এই ছিলো তিন কুমারের নেশা। রমেন্দ্র পাশাপাশি শিকারে যেতেন, টমটম হাঁকাতেন। পছন্দ করতেন লাঠিখেলা। আর যেতেন বারবণিতা পল্লী। দিনের প্রায় বেশিরভাগ সময়ই তিনি কাটাতেন সেখানে। চালচলন, পোশাক-আশাকে তাকে দেখে কে বলবে এ প্রতাপশালী জমিদার রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের পুত্র। রাণী বিলাসমণি বড়ো শখ রমেন্দ্রর সাথে হুগলীর বিষ্ণুপদ মুখার্জির মধ্যমা কন্যা অপূর্ব সুন্দরী দেবী বিভাবতীর বিয়ে দেন। কিন্তু ঘরে সুন্দরী বউ রেখে রমেন্দ্র বাইরে আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকত। এত কিছুর পরেও প্রজারা কিন্তু রমেন্দ্রকে ভালোবাসতো, কারণ রমেন্দ্র অত্যাচারী ছিলো না।

নিজের শরীরের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা রমেন্দ্র একদিন অসুস্থ হলেন। পারিবারিক ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার বড়ো চিন্তায় পড়লেন। মেজোকুমার এমন এক রোগ বাঁধিয়েছেন, যা সর্বসম্মুখে প্রকাশ করা যায় না। মেজোরাণী পাশেই ছিলেন, তিনি বললেন, "ডাক্তার কি হয়েছে ওর?"

ডাক্তার কিছুক্ষণ ইস্তগত করে বললেন, "রাণীমা, মেজোকুমারের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের ফলে উনার শরীরে জঘন্য এক রোগ বাসা বেঁধেছে। যা অবস্থা তাতে শ্রীঘ্রই কলকাতা নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।"

কুমারের চিকিৎসার জন্য সকলে রওনা দিলেন কলকাতা, সঙ্গে চললেন মেজোরাণী বিভাবতীর ভাই সত্যেন্দ্রনাথ, বড়োকুমার ও বড়োরাণী। বিলাসমণির মৃত্যুর পর পরই এক বিভাবতীর ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাওয়াল রাজবাড়িতে প্রবেশ করেন। সত্যেন্দ্র রাজবাড়িতে এসেছিলেন মূলত শিলং-এ ডেপুটির চাকরি নেবেন বলে। কিন্তু জমিদারি পরিচালনায় কুমারদের দুর্বলতা দেখে তিনি রাজবাড়িতে জেঁকে বসেন। এমনকি রাজবাড়িতে রাণী বিভাবতীর চেয়েও বেশি প্রতাপে চলতেন তিনি। এদিকে কলকাতার ডাক্তার বললেন, কুমারের আবহাওয়া পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

ইতোমধ্যে, মেজোকুমার কিছুটা সুস্থ হয়েছেন এবং ফিরে গিয়েছেন আগের জীবনে। তবে শারীরিক অবস্থার কারণেই কিছুটা উদ্যোমতা কমেছে। এখন টমটম চালান, লাঠি খেলার আসর বসান আর শিকারে যান। দার্জিলিং যাত্রার দিন পনেরো আগে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারও শিকার করলেন। ইংরেজ ফটোগ্রাফার দিয়ে ছবি তোলালেন। পরবর্তীতে এই ছবিটাই টাইগার ফটো নামে পরিচিতি পায় এবং উক্ত ছবিটি উনবিংশ শতাব্দীর একটি অন্যতম ছবি হিসেবে বাংলাদেশ আর্কাইভস প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

একদিন মেজো কুমার, মেজো রানী, তার ভাই সত্যেন্দ্রনাথ, আশুতোষ

BanglaBook.org

ডাক্তারসহ প্রায় বিশ জনের একটি দল দার্জিলিংয়ে হাজির হলো। তারপর বেশ কিছুদিন কেটে যায়। মেজো কুমারের দেহের লাবণ্য ফিরে আসতে থাকে। কিন্তু, হঠাৎ একদিন মেজো কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ অসুস্থ হয়ে পড়লে আশু ডাক্তার তাকে পেট ফাঁপার ওষুধ দিলেন। মেজো কুমারের অবস্থা দেখে আশু ডাক্তার সে রাতে আর ওষুধ দেননি বরং পরদিন সিভিল সার্জনের কাছে আরও ভালো চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করেন। সিভিল সার্জন এক ধরনের মিক্চার মেজো কুমারকে খেতে দিয়েছিলেন। এরপর থেকেই মেজো কুমারের শারীরিক অবস্থার উত্থান-পতন শুরু হয়। এই অবস্থা দেখে বিভাবতীর জেদে রমেন্দ্রকে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া হসপিটালে নেওয়া হলো।

ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের ডাক্তার ক্যালভার্ট মেজো কুমারের যন্ত্রণা দেখে মরফিয়া ইনজেকশন দিতে চাইলেন কিন্তু মেজো কুমার রাজি হলেন না। বিকালের দিকে বাধ্য হয়েই মেজো কুমার ইনজেকশন নেন এবং এতে করে পেটের ব্যথা কমে যায়। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বেশ কয়েকবার বমি ও রক্তমিশ্রিত পায়খানা করার কারণে ভয়াবহ রকমের দুর্বল হয়ে পড়েন।

একসময় রাণী বিভাবতীর মামা বিবি সরকার নামে একজন ডাক্তার নিয়ে এলেন। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। ডাক্তার সরকার এসে, মেজো কুমারকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন।

দার্জিলিংয়ের পাহাড়ী নদীর ধারে শ্মশানটায় মেজোকুমারের দাহ হবে। ইতোমধ্যে রাত নেমে এসেছে। দার্জিলিংয়ের রাজবাড়িতে জনাকয়েক লোক এসেছে, এরা শ্মশানবন্ধু। মৃত রাজেন্দ্রকে নিয়ে বের হতেই শুরু হলো বৃষ্টি। শ্মশানে পৌঁছুতে ঝড়-বৃষ্টি আরো বেড়ে গিয়েছে। রাণী বিভাবতীর ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "লাশ এখানেই রেখে দে। কাল ভোরে দেখা যাবেখন।"

সবাই কাঁধের খাটিয়া নামাতে নামাতে বলে উঠলো, "বলো হরি... হরিবোল... বলো হরি... হরিবোল।

(৪)

বলো হরি... হরিবোল...বলো হরি...হরিবোল!

পাঁচজনের সন্ন্যাসীর দলটা এখন রাজশাহীর এক মহাশ্মশানে অবস্থান করছে। লোকনাথ বাবা দেখতে পেলেন গোরা সন্ন্যাসীটি হরিবোল শুনে কেমন জানি অস্থির হয়ে উঠে। তিনি শুধান, "কি হয়েচে বেটা? ইয়াদ পড়ে কিছু? বল বেটা, পারবি তুই পারবি।"

গোরা সন্ন্যাসীটির চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে যায়। হ্যাঁ! এই তো মনে পড়ে!

BanglaBook.org

বিশাল অট্টালিকা, জমিদারি, ইয়ার বন্ধুদের আর তার অসুখের কথা। দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে ভাওয়াল রাজা কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর। সেদিন সেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বৃষ্টির পানি গায়ে পড়তেই হুঁশ ফেরে রমেন্দ্রর। কিন্তু বেয়াড়া অসুখে স্মৃতি সব উধাও হওয়াতেই, *রাজা হলো সন্ন্যাসী*।

সন্ন্যাসীগুরুর কথামতো আরো দিন কতক শ্মশানে ঘুরে ঘুরে দিন কাটে রমেন্দ্রর। তারপর একদিন হাজির হলেন ঢাকায়। আহা কতদিন পর জন্মভূমির পানে ছুটে আসা।

পরদিন ঢাকার বাকল্যান্ড বাঁধের কাছে এক নাগা সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটলো। জটাচুল, ঘন দাড়ি, সারা গা ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীর সামনে ধুনি জ্বলছে। রাস্তার লোকেরা তাকে ফিরে ফিরে দেখে। এমন রাজকীয় চেহারার সন্ন্যাসী যে সচরাচর দেখা মেলে না। লোকেরা তার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলে। পরিচয় জানতে চাইলে সন্ন্যাসী বলে, আত্মপরিচয় দিতে গুরুর নিষেধ আছে। কেউ কেউ তখনই সন্ন্যাসীকে ভাওয়াল রাজা বলে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। ততদিনে ষড়যন্ত্র ছাড়াই সত্যেন্দ্র রাজবাড়ির কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছেন। কারণ তিন রছরের ব্যবধানে ছোটোকুমার ও বড়ো কুমার মারা দু'জনই মারা যায়।

প্রজাদের মধ্যে ক্রমাগত ক্ষোভ বাড়ছিল।

ঢাকায় আগত সন্ন্যাসীর সাথে মেজোকুমারের অসংখ্য মিল খুঁজে পাওয়াতে প্রজারা আবার আশায় বুক বাঁধে। দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে ফিরে আসবে মেজোকুমার। তারপর এলো সেই দিন...

অন্যদিনের মতোই নিস্তেজ, নিস্পৃহ একটি দিনের শুরু হলো। চাকরেরা বিশাল প্রাসাদের কাজকর্ম শুরু করেছে। সত্যেন্দ্রনাথ একটি বিশেষ কাজে বাইরে গিয়েছেন। বহুদিনের পুরোনো একজন চাকর বাড়ির বাইরে গিয়েছিল কাজে, সে দৌড়ে এসে বলল, "ও রে মেজোকুমার, ফিরে এসেছে! রে কোথায় আছিস! সন্ন্যাসী হয়ে মেজোকুমার ফিরে এসেছে।"

মুহূর্তেই একটা গন্ডগোল পাকিয়ে ওঠে প্রাসাদে। বেলা বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে রাজবাড়ির সামনের ভীড়। ভীড়ের ভেতরে এক সাধু, পরনে নেংটি, সারা গায়ে ছাই মাখা। কিন্তু অদ্ভুত মিল মেজোকুমারের সাথে! ভেতর থেকে একজন সন্ন্যাসীর পরিচয় জানতে চায়। কিন্তু সন্ন্যাসী চুপ। একসময়, কেউ একজন অন্য কুমারদের বাঁধানো ছবিগুলো নিয়ে আসে। সন্ন্যাসী চোখ তুলে একবার দেখে তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে।

দুপুর পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ হলো। রাজবাড়ির ভীড় তবু বাড়ছে। একসময় মেজোকুমারের বোন জ্যোতিময়ী দেবী এলেন সন্ন্যাসীকে দেখতে। অবিকল যেন মৃত রমেন্দ্র নারায়ণ। কিছুক্ষণ চুপচাপ সময় কেটে যায়। তারপর

BanglaBook.org

নীরবতা ভেঙে জ্যোর্তিময়ী দেবী সন্ন্যাসীকে আহ্বান করে ভেতর বাড়িতে। যেন কত দিনের পরিচিত বাড়ি, সেভাবে বাড়িতে প্রবেশ করে সন্ন্যাসী, সাথে হাজার হাজার প্রজা। সন্ন্যাসীর ধূলিমাখা পা দুধ দিয়ে ধুইয়ে দেয় জ্যোতিময়ী। চোখে পড়ে ভাইয়ের শরীরের বিশেষ দাগগুলো। এরপর খেতে দিলে দেখতে পান খাবার সময় ভাইয়ের অভ্যাসগুলো।

খাওয়া শেষে হলে জ্যোতিময়ী সাধুকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনার নাম?"

পরিষ্কার গলায় সন্ন্যাসী উত্তর দেয়, "রাজা রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী।"

"মাতার নাম?"

"বিলাসমণি দেবী।"

"যার কোলে মানুষ হয়েছেন, আপনার ধাত্রী মাতার নাম?"

"অলকা..."

বহুদিনের পুরোনো স্মৃতি মানসপটে সইতে পারলো না রমেন্দ্র নারায়ণের স্নায়ু। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। অজ্ঞান হবার আগ মুহূর্তে শুনতে পেলেন প্রসাদ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেউ একজন বলে উঠলো, "জয় রাজা রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর জয়!"

(৫)

মেজো কুমার মারা যাবার পর যে সন্ন্যাসী ফিরে এসেছিলেন তিনিই যে ভাওয়ালগড়ের মেজো কুমার তা উচ্চতা, জামার মাপ, জুতার মাপ, চুলের রং, শরীরের বিশেষ চিহ্নগুলোর সবই সন্ন্যাসী মেজো কুমার বলে প্রতীয়মান হন। বোন জ্যোতিময়ী ছাড়াও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা শরীরের জন্মদাগ ও বিভিন্ন দুর্ঘটনার ফলে চিহ্নিত দাগগুলো খুঁজে পান। এছাড়া সন্ন্যাসীই যে মেজোকুমার তা তিনটি আদালতে বিভিন্ন সাক্ষ্য, ডাক্তারদের রিপোর্ট ইত্যাদির ভিত্তিতে জয় লাভ করেন। বিশ্বজুড়ে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা মামলাটি জিতেও কিন্তু রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী বেশিদিন বাঁচেননি। আদালতের রায়ে জয়লাভ করার পরপরই তার মৃত্যু হয়। তাকে নিয়ে লেখা হয়েছে বহু গল্প, উপন্যাস। তৈরি হয়েছে সিনেমা, সে সময় উত্তমকুমার অভিনীত *সন্ন্যাসী রাজা* বেশ প্রশংসিত হয়। অতি সম্প্রতি সময়ে যীশু সেনগুপ্ত অভিনীত *এক যে ছিলো রাজা* সিনেমাটিও ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে।

ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার পরে জমিদারির উত্তরাধিকারের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে এবং ফলে এর ব্যবস্থাপনা ১৯৫১ সালে জমিদারি প্রথা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনেই থেকে যায়। যেহেতু উত্তরাধিকারী

BanglaBook.org

নিয়ে বহু জটিলতা ছিল এবং জমিদারি সংক্রান্ত বহু মামলাও অমীমাংসিত ছিল, সে কারণে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণার পরেও এর বিষয়-সম্পত্তি বা দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে বণ্টন করা সম্ভব হয়নি। ফলে পাকিস্তান আমলেও জমিদারিটি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনেই থাকে। বর্তমানে ভাওয়াল এস্টেটের কর্মকাণ্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি সংস্কার বোর্ড পরিচালনা করে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

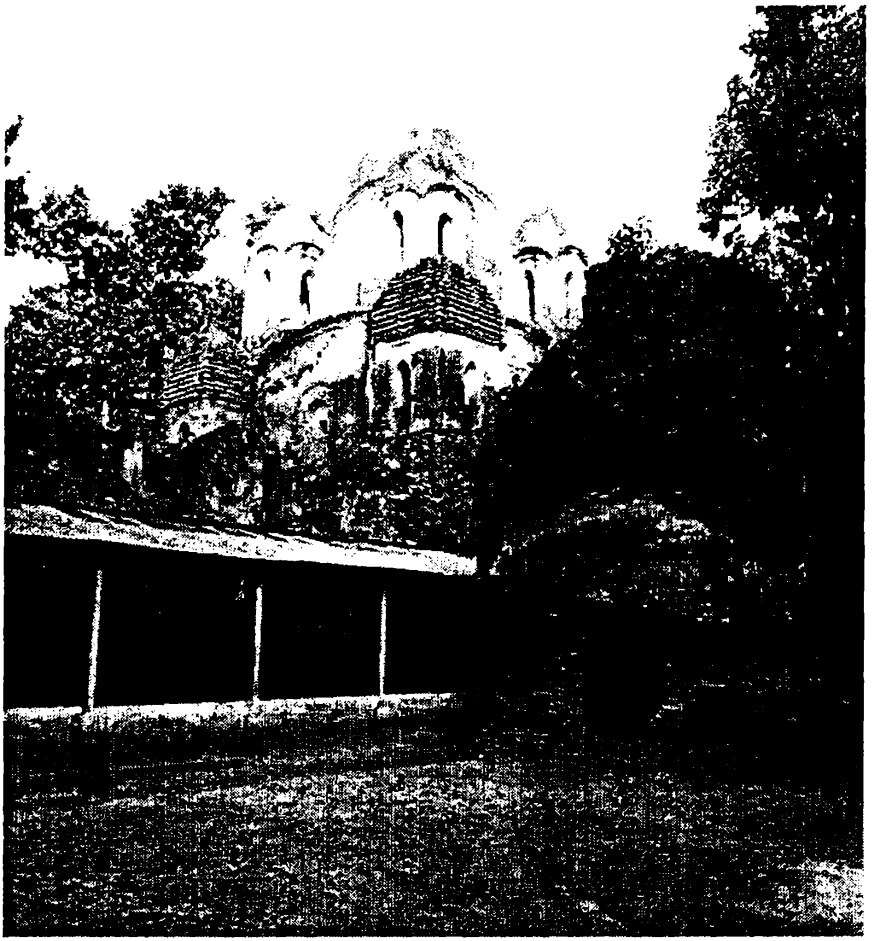

শ্যামসুন্দর মঠ : রাণী রাসমণি

বাংলার মসনদে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। শুরু হয়েছে ইংরেজদের গোলামী আর চাটুকারিতা। এরপরেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিছু কিছু জনপদে স্বাধীন জমিদারেরা টিকে আছে সগৌরবে। ইংরেজ শাসনের উত্তাপের ঢেউ এসে পৌঁছায়নি বাংলার সব অংশে। তেমনই এক জনপদ সাতঘরিয়া। বঙ্গোপসাগরের আঁচল ছোঁয়া সুন্দরবন, আর সুন্দরবনকে বুকে নিয়ে সমৃদ্ধ এখানকার প্রকৃতি।

সপ্তম শতকে শশাঙ্ক, ভদ্রবংশ, খরগোরাত ও লোকনাথ বংশ রাজত্ব করছিলেন এ জনপদে। এদের মধ্যে রাজা শশাংক ছিলেন ইতিহাসখ্যাত নরপতি। এরপরে বাংলার মসনদে মুসলিম শাসন গোড়াপত্তন করলে বিস্তৃত

BanglaBook.org

রাজ্যেগুলো পরিণত হয় জমিদারির। আবার ফিরে আসি সাতঘরিয়ায়।

নিকটবর্তী সুন্দরবন ও অসংখ্য নদ-নদীর প্রভাবে সাতঘরিয়ার অর্থনীতি ছিলো টইটম্বুর। জমিদার বৃদ্ধ রায় চৌধুরী মারা গিয়েছেন অনেক আগে। তার এগারো সন্তানের সকলে কন্যা হওয়াতে গোলযোগ বেঁধেছিল জমিদারি নিয়ে। কিন্তু শক্ত হাতে জমিদারির হাল ধরলেন জমিদার পত্নী রাণী রাসমণি দেবী। মুঘল সম্রাজ্যের সময়ে প্রতাপশালী বারো ভূঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের উত্তরসূরী ধরা হয় তাকে। নারী হয়েও জমিদার রাসমণি নৃশংসতায় কারো চেয়ে কম নয়, বরং আরো বেশি নৃশংস, আরো ভয়ঙ্কর। প্রজারা তার শাসনে কেঁপে কেঁপে উঠে। যৌবনে একবার অসুখে পড়ে মা কালীর আরাধনায় সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তারপর থেকেই কালীর প্রতি তার অপরিসীম ভক্তি। জমিদার বাড়িতে নিয়মিত সাধন ভোজন ও মহা ধুমধাম করে কালীপূজা হয়। কালীপূজার সময় বলির রক্তের বন্যায় ভেসে যেত মণ্ডপ। পূজা চলাকালীন তিনদিন জলস্পর্শ করতেন না রাণী রাসমণি। তান্ত্রিকসিদ্ধ গুরু শ্যামসুন্দর মা কালীর পূজা পরিচালনা করতেন।

নৃশংস রাসমণি শক্তি লাভের আশায় গভীর রাতে উলঙ্গ হয়ে মা কালীর বেদীতে অর্ঘ্য নিবেদন করতেন।

দীর্ঘদিন জমিদারি দেখভালের কারণে রাসমণির স্বাস্থ্য ক্রমাগত ভেঙ্গে পড়ছিল। বয়স হয়েছে সত্তর। রাণী প্রাসাদ বারান্দায় বসে দেখেন যুবতী রমণীদের স্নানের দৃশ্য, চপলতার দৃশ্য। বার্ধ্যক্যের পরিণতি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না আর দশটা অত্যাচারী জমিদারের মতই। দেখেন আর আফসোস করেন, ইস্ যদি তার বয়সও এমন হতো! না পেরে তিনি গেলেন তান্ত্রিকগুরু শ্যামসুন্দরের কাছে। তান্ত্রিক গুরু বাতলালেন ততোধিক নৃশংস একটি উপায়। অত্যাচারী রাসমণি নিজেও ক্ষণিকের জন্য চমকে উঠলেন। কিন্তু রাসমণি তখন বৃদ্ধত্বকে জয় করার নেশায় পাগল। এই পদ্ধতির খারাপ বা অশুভ দিক ভেবে দেখার মতো শুভ বুদ্ধির উদয় কিন্তু তার হলো না।

কিন্তু তবুও সেটা করতে হবে গোপনে যতই অত্যাচারী হন না কেন, সে উপায় প্রকাশ পেলে মানুষ মেনে নেবে না। নিকটেই কলকাতা, বাংলার মসনদে আসীন ইংরেজদের লোলুপদৃষ্টি এসব সমৃদ্ধশালী জমিদারিগুলোর দিকে।

শ্যামসুন্দর নামে সেই তান্ত্রিক গুরু তখন তৈরী করালেন তিনতলা অপূর্ব এক মন্দির। তিনতলা সেই মন্দিরের তৃতীয় তলায় মা কালীর অধিষ্ঠান।

দোতলায় শ্যামসুন্দরের স্থান হলো। তিনি দেবীর আরাধনায় রাসমণির জন্য পূজোর প্রস্তুতি নেন। নিচের গর্ভগৃহে তৈরী হলো কষ্টিপাথরের বেদী।

সেটা এমনভাবে তৈরি হলো যেন নিকষকালো অন্ধকারে সবসময় ঢাকা থাকে জায়গাটা । সকল আয়োজন শেষ করার পর শুরু হলো রাসমণির বয়স কমানোর

BanglaBook.org

যুদ্ধ। তান্ত্রিকের বাতলানো পদ্ধতি ছিলো বাস্তবিকই ভয়ঙ্কর। অরক্ষনীয়া যেসব কন্যা বিবাহের পরপরই বিধবা হয়েছে তাদেরকে মা কালীর বেদিতে বলি দিতে হবে।

তারপর সেই বলির রক্ত সারা শরীরে মেখে বলির মাথা ভেট হিসাবে দিতে হবে মা কালীকে। রাসমণির হুকুমে তার নিজস্ব লেঠেল বাহিনী প্রচুর অর্থ সহকারে এদের চারিদিকে ছড়িয়ে দিলেন।

এর ভেতরে কয়েকজন ছিলো তার সব অপকর্মের হোতা। তাদের প্রতি হুকুম হলো প্রতি অমাবস্যায় একজন অরক্ষনীয়া বিধবা নারী তার চাই। এরপর থেকে প্রতি অমাবস্যায় এক এক করে হারিয়ে যেতে লাগলো বিধবা কন্যারা। তাই কয়েক মাস তান্ত্রিকের বলির হাড়িকাঠে গলা দেওয়ার মতো নারীর অভাব হয়নি। কিন্তু, এবার সতর্কও হয়ে উঠলো প্রজারা। বিধবা নারীদের আর সহজে বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। লেঠেলেরা পড়লো মুসিবতে। কিন্তু হুকুম যখন রাণী রাসমণির তখন পালন তো করতেই হবে।

ওদিকে সংসারের নানা কাজে বিধবাদের নিয়মিত বের হতেই হয়। সংসারিক কাজকর্ম সেরে তাড়াতাড়ি সবাই দোর লাগিয়ে দিয়ে পড়ে।

পাশের গ্রামের অনন্ত ঠাকুরের কন্যা বিনুবালা। অনন্ত ঠাকুর ছিলেন রাসমনির পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরামের কুল পুরোহিত। তিনি বেশ আশা করে সুপাত্র দেখে একমাত্র কন্যা বিনুবালার বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুখ পেলো না কন্যা। বিয়ের পরেরদিনই সাপের ছোবলে প্রাণ দিলো জামাই। তারপর থেকে বিনুবালা পিতার কাছেই থাকে।

সেদিন বাড়ির কাজগুলো করতে একটু দেরিই হয়ে যায় বিনুবালার, অনন্ত ঠাকুর গিয়েছেন পাশের গাঁয়ে এক যজমান বাড়িতে। এই সুযোগে তাকে সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালানোর সময়ে মুখ চেপে তুলে আনা হলো। অনন্ত ঠাকুর বাড়িতে বিনুবালাকে না দেখে বুঝে ফেললেন, এ কার কাজ হতে পারে। তিনি রাসমণির এসব কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আগেই জেনে ছিলেন। ছুটে এলেন জমিদার বাড়িতে। রাসমনির পায়ে পড়ে একমাত্র মেয়ের জীবন ভিক্ষা চাইলেন। যৌবন ফিরে আসার লালসায় রাসমণি অনন্ত ঠাকুরকে পাত্তাই দিলেন না। ভয় পেলেন যদি অনন্ত ঠাকুর সবকিছু বলে দেয় সবাইকে! তিনি লেঠেলদের হুকুম দিলেন রাতের অন্ধকারে ব্রাহ্মণকে মেরে সোনাই নদীর তীরে পুতে ফেলার।

যথা সময়ে অমাবস্যার রাত হলো। বেদী প্রস্তুত হলো পূজার জন্য। পূজার অর্ঘ্য বিনুবানার ছিন্ন মস্তক নিয়ে রাণী রাসমণি মা কালীর প্রতিমার সামনে দাঁড়ালেন। ঠিক তখনই ভেসে এলো দেবীর ভয়ঙ্কর স্বরের অভিশাপ বানী, "তোর পাপের ঘটপূর্ণ হয়েছে। পাপাচারী এবার সবংশে নিপাত হবি তুই।"

BanglaBook.org

চমকে উঠলেন রাসমণি, হাতের সবকিছু ছিটকে পড়লো মাটিতে। হাহাহা অট্টহাসিতে গমগম করে উঠল গর্ভগৃহের অন্ধকার কোণ। ততক্ষণে তান্ত্রিক শ্যামসুন্দর পালিয়েছে। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন রাণী রাসমণি।

এরপর একের পর এক সন্তান মারা যেতে শুরু করলো রাসমণির। প্রায় উন্মাদ হয়ে গেলেন তিনি। তান্ত্রিককে দিলেন তাড়িয়ে। শ্যামসুন্দর মন্দিরের মা কালীর মূর্তি দিলেন মন্দিরের সামনে বিসর্জন। এগারো সন্তানের নামে স্থাপন করলেন এগারোটি শিবলিঙ্গ। রুদ্রের কাছে প্রার্থনা শুরু করলেন মুক্তির আশায়। ব্রাহ্মণ অনন্ত ঠাকুর হত্যার এগারোতম মাসে মারা গেলো রাসমণির কনিষ্ঠ কন্যা। রাসমণি এই এগারো মাসে এগারো বছর বয়স বেশি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু যৌবন ফিরে পাওয়ার নোংরা খেলায় হেরে গেছেন তিনি। পরের মাসের অমাবস্যায় শুরু হলো রাসমণির মাথা যন্ত্রণা শুরু। তীব্র যন্ত্রণায় রাণী ছটফট করতে লাগলেন। কোনো কবিরাজ-বদ্যি নিদান দিলেন কিন্তু ব্যথা বেড়েই চললো।

গভীর রাতে যখন মাথাব্যাথা কম হলো তখন অত্যাচারী রাণী শুনলেন নিচের গর্ভগৃহ থেকে ভেসে আসছে এক পরিচিত শব্দ। এই শব্দ তিনি বহুবার শুনেছেন। এটা তো বলির পরে রক্তপ্রবাহের স্রোত বহার শব্দ! তান্ত্রিক তো নেই, তবে! তবে কে দিলো বলি! রাণী প্রদীপ নিয়ে একাই নামলেন। পেঁচানো সিড়ি বেয়ে নামতেই হঠাৎ প্রদীপ নিভে গেলো। নিকষ কালো অন্ধকার থেকে ভেসে এলো অপার্থিব এক চিৎকার।

পরেরদিন রাণীর খোঁজে সবাই বের হয়ে দেখলো গর্ভগৃহের নিচে যাবার দরজাটি খোলা। সবাই মিলে আলো নিয়ে নিচে নেমে দেখতে পেলেন বিভৎস এক দৃশ্য। হাড়িকাঠে রাণী গলা দিয়ে আছেন, শুধু মুণ্ডু আছে দেহের খোঁজ নেই। রাণীর দু'চোখ ভরে বেঁচে থাকার কি আকুতি, কি ভয়ঙ্কর ভয়! একি! কালীমূর্তিটি ফিরে এলো কীভাবে? বেদীতে কালীমূর্তির বের হওয়া রক্তলাল জিহ্বাগ্র ভাগ দেখে শিউরে উঠলেন রাণীর নায়েব। সেভাবেই রাণীকে রেখে সবাইকে নিয়ে বের হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাটি দিয়ে গর্ভগৃহ ভরাট করে দিলেন তিনি। তারপর কালের পরাক্রমায় শ্যামাসুন্দর মন্দির পরিণত হলো নির্জন হানাবাড়িতে।

এরপর একসময় স্বামী বিবেকানন্দের এক শিষ্য, অন্য মতে স্বয়ং বিবেকানন্দ এক সফরে এসে এই মন্দির পুনরায় মঠ হিসাবে চালু করেন।

রাসমণির স্মৃতিস্বরূপ এগারোটা শিবলিঙ্গের ঘরের ধ্বংসস্তুপ ও একটা কাঁঠালচাপা গাছ এখনো বিদ্যমান। সাতক্ষীরার সোনাবাড়িয়া শ্যামসুন্দর মঠটি নিয়ে এমনই কিংবদন্তী স্থানীয় মানুষে মুখে মুখে শোনা যায়।

BanglaBook.org

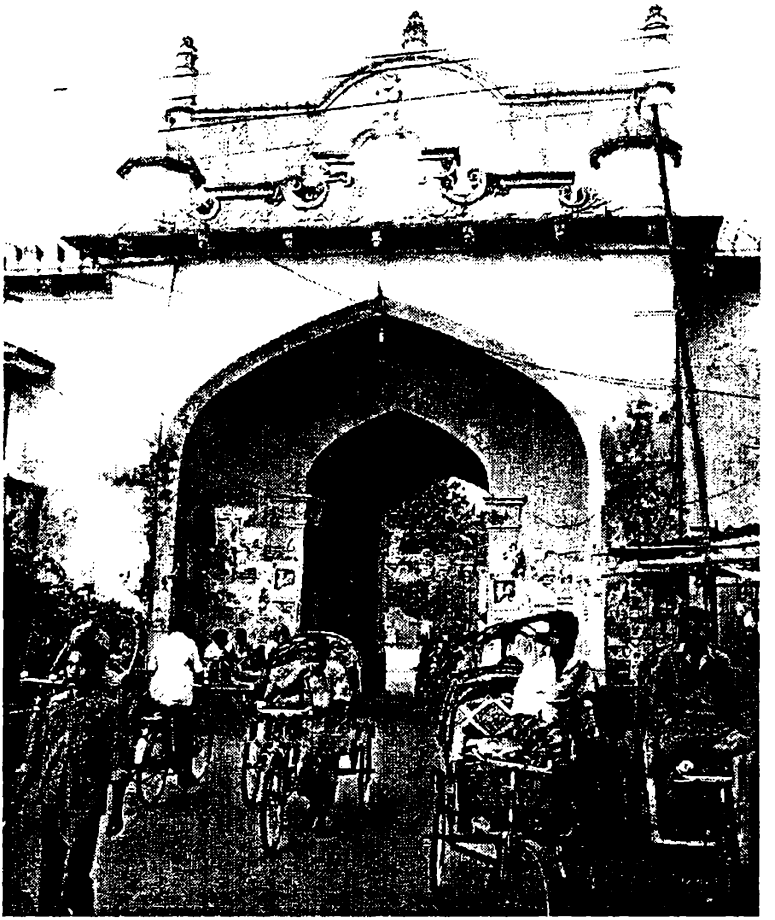

দিনাজপুরের রংমহল

১৭৭২ সাল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সবে বাংলার মসনদে গুছিয়ে বসেছে। কিন্তু বাংলার বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য সামন্ত রাজা। এদের কাছ থেকে ঘাম ছুটে যায় গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের। কূটিল বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হেস্টিং কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই পরিকল্পনাতেই এতদূর বিস্তার লাভ করেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি উচ্চ বেতনে দিনাজপুরের দেওয়ান করে পাঠালেন এক হিন্দু বাঙালী যুবক। নাম তার দেবী সিংহ।

বাঙালী যুবক দেওয়ান দেবী সিংহ দিনাজপুর পৌছুলেন যখন সনটা সতেরো শ একাশি। দেবী সিংহ আসন গাড়লো রাজবাড়ির কাছাকাছি বড়োবন্দরে।

BanglaBook.org

এখানেই ছিলো ইংরেজদের কাছারি দালান। এরই একপাশে সে বানিয়ে নিলো রংমহল। প্রজারা কিন্তু সামন্ত রাজার অত্যাচারে ভেবেছিল বাঙালী দেওয়ানের আগমনে এবার শোষণের দিন শেষ হলো। কিন্তু, দেবী সিংহ ছিলো সামন্ত রাজাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তার হৃদয়ে দয়ামায়ার কোনো রেশই ছিলো না। এছাড়াও যত্তসব বাজে স্বভাবে মহিমান্বিত ছিলেন দেবী সিংহ। খাজনার নামে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া সুদ আদায়। অনাদায়ে ভূমি, বসতভিটা দখল করাই শুধু দেবী সিংহের কাজ নয়। তার আরো একটি বড়ো দুর্বলতা হচ্ছে নারী ও সুরা । সুরায় মত্ত হয়ে নারীর সতীত্ব হরণ করা।

শাসনের নামে সারাদিন অত্যাচার করে দেবী সিংহ রাতে রংমহলে হামলে পড়েন ধরে আনা কুমারীর শরীরে। নিজের ভোগকৃত রমনীদের আবার পাঠায় ইংরেজ শিবিরে ভেট হিসেবে। এভাবেই সূচনা হলো সকরুণ এক ইতিহাসের।

এই জঘন্য কর্মের সহকারী দেবী সিংহের সাগরেদ রহমত বক্স। রহমত বক্স দেবী সিংহের চেয়েও বেশি নৃশংস, নরপিচাশ। দেবী সিংহ আদেশ করেন আর পালন করে রহমত বক্স। মালিকের জন্য নিয়মিত কুমারী কন্যা সংগ্রহের ভার পড়ে রহমত বক্সের ওপর। ছলে-বলে কৌশলে প্রতিরাতে অক্ষত যোনি কন্যাকে রংমহলে হাজির করে রহমত। রংমহলের বিশাল ছাদ, দরজা-জানালার রঙিন কাঁচ সব কেঁপে কেঁপে উঠে দেবী সিংহের নৃশংসতায়।

একদিন দেবী সিংহ, রহমত বক্স ও পেয়াদাদের নিয়ে বের হয়েছেন খাজনা আদায়ে। দিনে দিনে কুমারী মেয়ের সংখ্যা যেমন কমতে শুরু করেছে। রহমত বক্সের অত্যাচারে কেউ ঘরে কুমারী মেয়ে রাখেন না। তাই কাজ খাজনা আদায়ের হলেও রহমত বক্স খুঁজছিল মালিকের রাতের খোরাকের জন্য কুমারী কন্যা। হঠাৎ চোখ পড়ে যায় গরীব ব্রাহ্মণ নিকুঞ্জ চক্রবর্তীর দুই কুমারী কন্যার দিকে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দুটি যেন স্বর্গের অপ্সরা। চন্দ্রাবতী ও সূর্যমতী, দুই বোনে গরীব ব্রাহ্মণের ঘর আলো করে ছিল । চোখ পড়ে যায় দেবী সিংহেরও। কানে কানে রহমত বক্সের কাছে জানিয়ে দেয়, বড়োকন্যাটি চাই তার। সহায় সম্বলহীন গরীব ব্রাহ্মণের জায়গা-জমি বলতে কিছুই নেই। তবু কাগজে-কলমে অনাদায়ী খাজনার মামলা পড়ে যায় নিকুঞ্জ চক্রবর্তীর নামে। সিপাহী এসে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় গরীব ব্রাহ্মণকে। আগেই চন্দ্রাবতীকে নিয়ে গেছে রহমত বক্স।

BanglaBook.org

কাছারিতে এসে কত আকুতিমিনতি করেন নিকুঞ্জ বাবু। অন্তত মেয়েটাকে যেন ছেড়ে দেন দেওয়ান। কিন্তু ভোগ বিলাসে মত্ত দেবী সিংহ পাত্তাই দিলো না ব্রাহ্মণকে। একসময় বিরক্ত হয়ে হাতের চাবুকটা দিয়ে আচ্ছামতো চাবকালেন বৃদ্ধ নিকুঞ্জকে।

যথারীতি রাত হলো। আলোর রোশনাইয়ে ভরে উঠলো রংমহল। ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে গানা-বাজনা আর মদের নহর বইলো। নেশা যখন চরমে তখন রহমত বক্স নিয়ে এলো চন্দ্রাবতীকে। অপরূপা চন্দ্রাবতীকে যেন মরীচিকা বলে ভ্রম হয় দেবী সিংহের। এত সুন্দর কেউ হতে পারে! সে রহমতকে বলে, "এ তুমি কাকে এনেছ রহমত? কোনো মানবী নাকি স্বর্গের উর্বশী!"

গদগদকণ্ঠে রহমত বলে, "হুজুর এ তো আপনার জন্য সামান্য তোফা হুজুর। সেই যে ব্রাহ্মণ ব্যাটার বড়ো কন্যা চন্দ্রাবতী।"

"চন্দ্রাবতী! বাহ্ নামের সাথে কী অপূর্ব সৌন্দর্য্য। কাল মনে করে নাজারানা নিয়ে নিও রহমত। এখন যাও তোমরা।" লোলুপ দৃষ্টিতে চন্দ্রাবতীর দিকে তাকিয়ে বলে দেবী সিংহ।

একসময় সকলে চলে যায়। দেবী সিংহ টলটলতে এসে চন্দ্রাবতীর হাতটা ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। সদ্য কৈশোর পেরুনো চন্দ্রাবতী ছিটকে ওঠে। তারপর দেবী সিংহের পায়ে পড়ে নিজ সতীত্ব রক্ষার জন্য বারবার বলে, "হুজুর ছেড়ে দেন হুজুর, রক্ষা করুন।"

কিন্তু পাষাণ হৃদয় দেবী সিংহের মন গললো না। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো চন্দ্রাবতীর ওপর। রাতভর চললো অকথ্য নির্যাতন। চন্দ্রাবতীর ঘনঘন মরণঘাতী চিৎকার রংমহলের ভেতরে গুমড়ে গুমড়ে ওঠে। তবু শেষ দমটুকু না যাওয়া পর্যন্ত শয়তানের থাবায় নিঃশেষিত হতে থাকে চন্দ্রাবতী। একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে চন্দ্রাবতী।

ওদিকে চন্দ্রাবতীর বোন সূর্যমতী রাতের আঁধারে দেওয়ানের অত্যাচারের শিকার হওয়া সবাইকে জমায়েত করে। বহু সহ্য করেছে, আর করা যায় না। এবার হানতে হবে চরম আঘাত। এরই লক্ষ্যে পুকুর পাড়ে জমা হতে থাকে লাঠি-সোঠা, মাছ ধরার কোঁচ, বল্লম, সরা, সুরকি। ভোরের আলো ফোটার আগে আগে হাজির হয় রংমহলের সামনে। ততক্ষণে সব চুপচাপ হয়ে গেছে। ক্লান্ত, নেশাতুর দেবী সিংহ বিবস্ত্র অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছে। জানতেও পারলো না কী ভয়ঙ্কর দিনের সূচনা হচ্ছে তার।

তারপর একসময় প্রজারা হামলা করলো রংমহল। মাছ ধরার কোঁচে প্রাণ দিলো নরপিশাচ রহমত বক্স। দেবী সিংহে কিন্তু ধরতে পারলো না। প্রচণ্ড কোলাহলে ঘুম ভাঙতেই চোখ পড়ে বাইরে। এরপরই নেশা কেটে যায় দেবী সিংহের। কোনোরকম বিছানা ছেড়ে পোশাক পরে গুপ্ত দরজা দিয়ে পালায় অজানার উদ্দেশ্যে।

বহুদিনের পুরাতন ক্ষোভ ও অত্যাচারীর শিকার হওয়া প্রজারা রংমহলসহ সবকিছুতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তখন থেকেই রংমহল পরিণত হলো ধ্বংসস্তূপে।

BanglaBook.org

এরপরই ঘটতে লাগলো অদ্ভূত সব ঘটনা। ধ্বংসপ্রায় রংমহলে শোনা যায় নুপূরের রুনুঝুনু ধ্বনি। কখনো বা ভেতর থেকে ভেসে আসে মেয়ে কণ্ঠের অট্টহাসি কিংবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। হয়তো কোনো অচেনা অচিন পথিক পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। কোত্থেকে যেন এক পশলা হাওয়া এসে নাস্তানাবুদ করে তাকে। চমকে উঠে দ্রুত পা চালায় পথিক। লোকে ধীরে ধীরে দালানটির নাম রংমহল থেকে ডাকতে শুরু করে চন্দ্রাবতীর মহল। লোকে বলে চন্দ্রাবতীর অতৃপ্ত আত্মা আজো খুঁজে ফিরে দেবী সিংহকে।

বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে শান্ত একটি শহর দিনাজপুর। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত দিনাজপুরে ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের অসংখ্য নিদর্শন। তেমনই ছিলো বড়োবন্দরের কুঠিবাড়ি। ছিলো দেবী সিংহের রংমহল। বড়োবন্দরে রয়ে যাওয়া তিনটি ধ্বংসস্তূপেরও ঠিক হদিস পাওয়া যায় না। একটি ধূলোয় মিশে গেছে। একটি ব্যবহৃত হয় চটের গোডাউন হিসেবে। আরেকটিতে মানুষ এখনো থাকে কিন্তু কেউ নাকি টিকতে পারে না বেশি দিন। ধারণা করা হয় এটিই ছিলো দেবী সিংহের রংমহল। কিন্তু দিনাজপুর-রংপুরের ইতিহাসে দেবী সিংহের অত্যাচার ও নৃশংসতার কথা উল্লেখ্য করা আছে স্পষ্টভাবে। প্রজা অত্যাচার ও নিয়মিত নারী ধর্ষণের খবর পৌঁছেছিল ইংরেজ দরবারেও। তাদের দেশের ওয়েস্ট মিনিস্টার হলে দেবী সিংহের কর্মকাণ্ড প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। দেওয়ান দেবী সিংহ ও তার দুই বন্ধু গুডল্যান্ড ও গঙ্গাগোবিন্দ মোট তিনজনে মিলে প্রজাদের ওপর অত্যাচার করতেন। এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'র অত্যাচারী ইজারাদারকে নিশ্চয় ভুলে যাননি? মূলত এই দেবী সিংহের আদলেই বঙ্কিম বাবু সৃষ্টি করেন অত্যাচারি ইজারাদারটিকে।

BanglaBook.org

তথ্যসূত্র :

*বাংলাদেশের কিংবদন্তী–শামসুল ইসলাস
*বাংলাদেশের লোক কাহিনি–হুমায়ুন রহমান
*উত্তরবঙ্গের কিংবদন্তী–হুমায়ুন রহমান
*সুন্দরবনের আতঙ্ক–দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
*ঢাকা : স্মৃতি-বিস্মৃতির শহর–মুনতাসির মামুন
*বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (জেলা ভিত্তিক বইসমূহ)
*কিংবদন্তী কথা কয়–মোফাজ্জল হোসেন
*বঙ্গদেশীয় মাইথোলজি–রাজিব চৌধুরী (পেন্ডুলাম)
*বাংলাদেশ জাতীয় ই-তথ্য বাতায়ন (জেলা ভিত্তিক)
*বাংলার কিংবদন্তী–শীলা বসাক
*কিংবদন্তীর বাংলা–ড. আশরাফ সিদ্দিকী
*বাংলাদেশের সুফী সাধকা–ড. গোলাম সাকলায়েন।
*উইকিপিডিয়া, বিভিন্ন ব্লগ ও অনলাইন পত্রিকা।
*ফিল্ড ওয়ার্ক থেকে সংগৃহীত কাহিনি।
*বাওয়ালী উপাখ্যান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG